

২৩
সংখ্যা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর মুখপত্র

কানযুল ইমান

Kanjul Iman

প্রকাশনায় :

কানযুল ইমান ফাউন্ডেশন

Bangladesh Anjuman-e Ashokauni-Mostafa
(Sallallahu Alayhi Wasallim)

কানযুল ইমান

Kanjul Iman

বর্ষ-০২, সংখ্যা-১২
মহরররম ১৪৩৪
ডিসেম্বর ২০১২

বাংলাদেশ - ১৫ টাকা
সৌদি - ২ রিয়াল
ইউএস - ২ ডলার

উপদেষ্টা পরিষদ

- ❖ আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী
- ❖ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আহসানুজ্জামান
- ❖ আল্লামা সৈয়দ মসিহুদ দৌলা
- ❖ আল্লামা এম.এ. মান্নান
- ❖ মাওলানা হাফেজ জুনায়েদুল হক নকশবন্দী মোজাদ্দেদী
- ❖ মাওলানা সৈয়দ ফকির মুসলিম উদ্দিন আহমদ
- ❖ আল্লামা আবুল কাশেম রেজভী
- ❖ মাওলানা গোলামুর রহমান আশরাফ শাহ

সম্পাদক : মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ হোসাইন আল কাদেরী
০১৭-১১ ৪৮ ৯৬ ৭৩

সহ-সম্পাদক : আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী হারুন
আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কালাম

নির্বাহী সম্পাদক : অধ্যাপক এম.এ. মোমেন
০১৭-১৫ ০৩ ০১ ৬৭

যুগ্ম সম্পাদক : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মতিন
০১৭-১১ ৮৬ ৩২ ৯৫

সার্কুলেশন সম্পাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম
০১৭-১১ ১৭ ৬৭ ২৩

বিজ্ঞাপন সম্পাদক : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু সাঈদ
০১৭-১২ ০০ ৬৯ ৭৪

আইন উপদেষ্টা : এড. মোহাম্মদ আলী আজম
০১৭-১১ ২০ ৩৭ ৪১

বিক্রয় প্রতিনিধি : মুহাম্মদ সেলিম মোল্লা, ০১৭৩৫৬৯৩৩৭৬

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন, ০১৮২৫৩৩৯৪৯৪

প্রকাশনায় ও স্বত্ব : কানযুল ইমানে ফাউন্ডেশন

সূচীপত্র

তাফসীরুল কোরআন- ০৩

কানযুল ইমান থেকে

দরসে হাদীস- ০৪

আশুরার তাৎপর্য- ০৬

কানযুল ইমান ডেস্ক

মুহাম্মদ ও আহমদ নামের তাৎপর্য- ০৯

মূল:- (ফার্সী) হযরত মাওলানা শাহওয়ালী উল্লাহ মোহাম্মদেস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে তরজমা ও তাশরিহ (উর্দু)
মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী
বঙ্গানুবাদ: মুহাম্মদ হারিছুর রহমান কাদেরী (আনোয়ারী)
মোজাদ্দেদে কাকে বলে? প্রতি শতকের মোজাদ্দেদে কে কে ছিলেন?- ১২

আ.ন.ম. মাসউদ হোসাইন আলকাদেরী

ছজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ হামেদ
রেযা খান বেরেলী (রহঃ)- ১৪

মুফতী আবু ছাফওয়ান মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ

কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর- ১৮

মূল: হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রা.)
অনুবাদ: অধ্যাপক লুৎফুর রহমান

আজানের পূর্বে ও পরে দুরুদ ছালাম নতুন
আবিষ্কার নয়- ২১

পীরজাদা মোহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ বাগদাদী

মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব- ২৩
ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ

তারিখে নজদ ও হেজাজ- ২৮

মুফতী মুহাম্মদ আবদুল কাইউম হাজারভী কাদেরী
প্রশ্ন উত্তর বিভাগ- ৩৩

বোবা হবার কারণ ও প্রতিকার- ৩৯

মঈনুল ইসলাম (হাসিব)

সম্পাদকীয় কার্যালয়: ২০৫/৫, আল-বশির প্লাজা, (২য় তলা) ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৯৩৪০৮০০, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১১৭৮৯, email : kanjuliman@yahoo.com

কানযুল ইমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস

২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত, ফোন : ৯৩৫৫৭৩৭, email : joynabpress@gmail.com

ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যা হার কারবালাকি বাদ

ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর কথা স্মরণে আসা মাত্রই প্রতিটি ঈমানদারের মনে ভেসে উঠে কারবালার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। কারবালা প্রান্তরে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় আদরের নাতি, আসাদুল্লাহিল গালিব ইসলামের ৪র্থ খলিফা হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) ও খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ৭০ জন সঙ্গী-সাথীসহ শহীদ হয়ে সত্য, ন্যায় ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনুসরণীয় অধ্যায় সংযোজন করেন। কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) সেদিন যে কোরবানী দেবার অনন্য নজির স্থাপন করেন তা যুগে যুগে শান্তিকামী মানুষকে দিয়ে আসছে এক দুর্দমনীয় অনুপ্রেরণা, দিয়ে আসছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার দুর্বীর উৎসাহ। কারবালা শিক্ষা দেয় শির দেব তবু ঈমান দেবনা, বাতিলের সাথে কোন আপোষ নয়। নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের ঝগড়াকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত রাখার যে শিক্ষা ইমাম হোসাইন আমাদেরকে দিয়ে গেছেন- তা আমাদের চলার পাথেয়।

কানযুল ঈমান এর সকল গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপন দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই হিজরী নববর্ষের শুভেচ্ছা।



وإذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا
نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه -
وهو الحق مصدقا لما معهم - قل فلم
تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مئمنين

بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل
الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من
يشاء من عباده فباء وبغضب على غضب
وللكافرين عذاب مهين *

কতোই নিকৃষ্ট বিনিময়ে তারা আপন আত্মাগুলোকে খরিদ করেছে! অর্থাৎ ওই সব লোকের কুফরকে তাদের 'মূল্যমান' সাব্যস্ত করেছেন। স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রতিটি মানুষ ব্যবসায়ীর মতো; জীবন হচ্ছে তার দোকান, জীবনের মুহূর্তগুলো হচ্ছে তার পণ্যদ্রব্য, যা প্রতিটি মুহূর্তে হ্রাস পাচ্ছে। সে মুহূর্তগুলো ব্যয় করে কর্মসমূহের পণ্য খরিদ করছে, যা সর্বদা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যে ব্যক্তি, সৎকর্ম রোজগার করে সে লাভবান ব্যবসায়ী আর যে কুফর ও গুনাহ উপার্জন করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকে। (তা' হলো) আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে (তারা) অস্বীকার করেছে মনের এ যাতনায় যে, আল্লাহ আপন অনুগ্রহে আপন যে বান্দার উপর ইচ্ছা করেন ওহী নাযিল করেন। বনী ইস্রাঈল এ হিংসারই বশবর্তী হয়েছে যে, 'খতমে নুবুয়ত' (শেষ নবী হবার মহান মর্যাদা) হযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন লাভ করলেন? কোন ইস্রাঈলীরই তা প্রাপ্য ছিলো। এ কারণে তারা হযুরের উপর ঈমান আনে নি। বুঝা গেলো যে, হিংসা কখনো ঈমান আনার পথেও বাঁধা সৃষ্টি করে। সুতরাং (তারা) ক্রোধের উপর ক্রোধের উপযোগী হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের গণহত্যা শিকার হয়েছে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনার শাস্তি।

এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযিলকৃতের উপর ঈমান আনো। এ থেকে জানা গেলো যে, সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর এবং হযুরের বাণীগুলোর উপর ঈমান আনা জরুরী। একটার অস্বীকারও কুফর। এটাই হচ্ছে নবীগণের অবস্থা; বরং এটাই মহান আহলে বায়ত ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের অবস্থা; অর্থাৎ (যথাক্রমে) সবার উপর ঈমান আনা ও সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। তখন বলে, 'যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান রাখি'; এবং বাকীগুলোকে তারা অস্বীকার করে; অথচ তা সত্য, তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়ন- কারী। যেসব পয়গাম্বর ও যেসব কিতাবের কথা কোরআন উল্লেখ করে নি, ওই সবই বিস্মৃত হয়ে রয়েছে। তাঁদের এবং ওইগুলো সম্পর্কে কেউ জানে না। (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'অতঃপর তোমরা পূর্ববর্তী নবীগণকে কেন শহীদ করেছো, যদি তোমাদের আপন কিতাবের উপর ঈমান ছিলো'?

বুঝা গেলো যে, পয়গাম্বরকে শহীদ করা কিংবা তাঁদের মানহানি করা কুফর। নবীগণের প্রতি সম্মান দেখানো ঈমানের প্রধান রুকন (স্তম্ভ)। একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকাও কুফর। এ কারণে বর্তমান যুগের বনী ইস্রাঈল যদিও নবীগণকে শহীদ করে নি, তবুও যেহেতু তারা হত্যাকারীদের ওই গর্হিত কাজের উপর সন্তুষ্ট ছিলো এবং হত্যাকারীদেরকে সম্মানে স্মরণ করে, সেহেতু তাদেরকেও হত্যাকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এমনই অবস্থা সৎকর্মগুলোরও।



عن ابى امامة ان رجلا سئل رسول الله ﷺ
ما الايمان قال اذا سرتك حسنتك وسائتك
سيئتك فانت مؤمن قال يا رسول الله فما الاثم
قال اذا حاك في نفسك شينى فذعه رواه احمد -

হযরত আবু উমামা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র পবিত্র দরবারে আরয করলো, “ঈমান কি?” অর্থাৎ মু'মিন হবার পরিচয় কি, যাতে আমি বুঝতে পারি যে, আমি এখন মু'মিন হয়েছি?
হযরত এরশাদ করলেন, “যখন তোমাকে স্বীয় নেকী আনন্দিত করবে এবং স্বীয় মন্দকাজ পীড়া দেবে, তাহলে তুমি কামিল মু'মিন।” সুবহানাল্লাহ! কতই সুন্দর পরিচিতি। মানুষ তিন ধরনের হয়ে থাকে- (১) গাফিল বা অলস, (২) আক্বিল বা বুদ্ধিমান এবং (৩) কামিল বা পরিপূর্ণ। ‘গাফিল’ হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে গুনাহ’র উপর খুশী থাকে এবং সাওয়াবের কাজে দুঃখ ও অনীহা প্রকাশ করে। যেমন কাফিরগণ কিংবা কিছু সংখ্যক ফাসিক-পাপী। ‘আক্বিল’ ওই ব্যক্তি, যে নেকিকে ভাল এবং গুনাহকে স্বীয় বিবেক দ্বারা মন্দ মনে করে; কিন্তু আমলের ব্যাপারে উদাসীন। ‘কামিল’ হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যাঁর কুলবের রঙ বদলে গেছে। তিনি নেকীর উপর তেমনি সন্তুষ্ট, যেমন তিনি বাদশাহী পেয়ে গেছেন, গুনাহ’র কারণে তেমনি মনক্ষুন্ন হন, যেমন- (তাঁর) সকল সম্পদ ও সম্ভান ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি বহু উঁচু স্তর। আল্লাহ তা'আলা নসীব করুন!

লোকটি পুনরায় আরয করলো, “এয়া রাসূলুল্লাহ! গুনাহ কি?” হযরত এরশাদ করলেন, “যে জিনিস তোমার অন্তরে বিদ্ধ হয় তা ছেড়ে দাও।” অর্থাৎ কামিল মু'মিনের অন্তরই গুনাহ ও সাওয়াবের মধ্যে পার্থক্য করে নিতে পারে। যেমন মানুষের আত্মা মাছি হয়

করে না, বমি করে ফেলে। অনুরূপ, ঈমানী আত্মা গুনাহ বরদাশ্ত করে না।

এ হাদীস ওইসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁরা ওই সাহাবীর ন্যায় কামিল মু'মিন হবে; আমাদের মত গুনাহগারদের ক্ষেত্রে নয়। আমরা তো অনেক ক্ষেত্রে মন্দ কার্যবলীকে নেক কাজ মনে করে থাকি।

وعن عمرو بن عبسة قال اتيت رسول الله ﷺ
فقلت يا رسول الله من معك على هذا الامر قال
حرو عبد قلت ما الاسلام قال طيب الكلام
واطعام الطعام قلت ما الايمان قال الصبر
والسماحة قال قلت اى الاسلام افضل قال من
سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت اى
الايمان افضل قال خلق حسن قال قلت اى
الصلوة افضل قال طول القنوت قال قلت اى
الهجرة افضل قال ان تهجر ماكره ربك قال
فقلت فای الجهاد افضل قال من عقر جواده
راهريق دمه - قال قلت اى الساعات افضل قال
جوف الليل الاخر رواه احمد -

হযরত আমর ইবনে ‘আবাসা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর উপনাম আবু শায়খ। তিনি বনু সালামা গোত্রের লোক। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্যতম। সুতরাং, তিনি ছিলেন চতুর্থ মুসলমান। হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র নির্দেশে স্বীয় গোত্র বনী সুলাইমে অবস্থান করেন। খায়বার বিজয়ের পরে মদীনা মুনাওয়রায় হাযির হন এবং সেখানে অবস্থান করেন। হযরত আমর ইবনে আবাসা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র খিদমতে হাযির হলাম এবং আরয করলাম, “হে আল্লাহর রসূল! ইসলামে আপনার সাথে কে কে আছে?” হযরত এরশাদ ফরমালেন, “এক গোলাম, এক আযাদ।” অর্থাৎ তখন পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত বেলাল রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ঈমান এনেছিলেন। যেহেতু হযরত আলী ছোট ছিলেন এবং হযরত খাদীজা রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মহিলা ছিলেন, সেহেতু তাঁদের উল্লেখ করেন নি। হযরতের এ বাণীর অর্থ এ যে, ইসলামে গোলাম ও আযাদ সকল প্রকার মানুষ অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থই অধিক শক্তিশালী। আমি আরয

করলাম, “ইসলাম কি”? অর্থাৎ মুসলমানের বিশেষ স্বভাবগুলো কি? অথবা ইসলামের পরিপূর্ণতা কি? হযুর এরশাদ করলেন, “উত্তম কথা বলা ও খানা খাওয়ানো”। এটা ইসলামী স্বভাব। ‘ভালকথা’র মধ্যে কালেমা তাইয়েবা, দ্বীন পৌছিয়ে দেওয়া, মানুষকে মন্দ থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখা এবং নম্র ভাষায় কথা বলা-সবই অন্তর্ভুক্ত। আর ‘খাওয়ানো’র মধ্যে মেহমানদারী, মুসাফির ও অভুক্তদেরকে পেট ভরে খাওয়ানো, শিশুদের প্রতিপালন করা- সবই অন্তর্ভুক্ত।

আমি আরয় করলাম, “ঈমান কি?” অর্থাৎ ঈমানের সুফল এবং মু’মিনের আলামত। এরশাদ করলেন, “সহনশীলতা ও দানশীলতা”, বহু ধরনের সবার রয়েছে- ইবাদতে সবার, গুনাহ থেকে সবার এবং বিপদে সবার। অর্থাৎ সর্বদা ইবাদত করা, কখনও গুনাহ না করা এবং মুসীবতের সময় না ঘাবড়ানো। অনুরূপ, (দানশীলতাও বিভিন্ন ধরনের। যেমন) ইলমের দানশীলতা, সম্পদের দানশীলতা, দ্বীনের দানশীলতা- সবই এর অন্তর্ভুক্ত। (বর্ণনাকারী) বললেন, আমি আরয় করলাম, “কোন ইসলাম উত্তম?” হযুর এরশাদ করলেন, “যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে”। তিনি বললেন, আমি আরয় করলাম, “কোন ঈমান উত্তম?” হযুর এরশাদ করলেন, “সৎ স্বভাব।” “সৎ স্বভাব” আল্লাহ’র বড় নি’মাত। এটা আমাদের হযুর সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম’কে মু’জিয়াস্বরূপ দান করা হয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **انك لعلى خلق عظيم** (নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত)। ‘খলুকে-ই হাসান’ হচ্ছে ওই স্বভাব- যা দ্বারা স্রষ্টাও সন্তুষ্ট, সৃষ্টিও। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর হস্তে পাকড়াও করা।

তিনি বললেন, “আমি আবার আরয় করলাম, “কোন ধরনের নামায উত্তম?” অর্থাৎ নামাযের কোন রুক্ন অথবা কোন ধরনের নামায উত্তম? এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামাযের রুক্নগুলো পরস্পর সমান নয়। এরশাদ করলেন, “দীর্ঘ ক্বিয়াম বিশিষ্ট নামায”। **قنوت** (কুনূত) অর্থ আনুগত্য, নম্রতা, নামায, দু’আ, চুপ থাকা এবং ক্বিয়াম। এখানে হয়তো বিনয় বুঝানো উদ্দেশ্য, অথবা একগ্রতা অথবা ক্বিয়াম বুঝানো উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অর্থ (ক্বিয়াম)ই অধিক স্পষ্ট।

স্মর্তব্য যে, কারো কারো মতে সাজদাহ উত্তম। কারো মতে ক্বিয়াম উত্তম। কারো ধারণামতে, রাতের নামাযে দীর্ঘ ক্বিয়াম উত্তম এবং দিনের নামাযে অধিক সাজদাহ

উত্তম; কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি তা’আলা আলাইহি’র মতে দীর্ঘ ক্বিয়াম উত্তম। কেননা, এতে কষ্ট ও ইবাদত বেশি। অর্থাৎ যদি এক ঘন্টা নফ পড়ে, তাহলে ছোট ছোট বিশ রাক্’আতের স্থলে দীর্ঘ চার রাক্’আত পড়বে। এ হাদীস ইমাম সাহেবের দলীল। যেসব বর্ণনায় অধিক সাজদাহকে উত্তম বলা হয়েছে, ওইগুলোতে নির্দিষ্ট কোন কারণ রয়েছে। বললেন, আমি আরয় করলাম, “কোন ধরনের হিজরত উত্তম?” হিজরত বহু প্রকারের রয়েছে। মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে হাবশার দিকে, মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে, কাফিররাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে, অজ্ঞতার স্থান থেকে ইলমের স্থানের দিকে-ইলম অর্জনের জন্য, গুনাহ থেকে নেকীর দিকে, কুফর থেকে ইসলামের দিকে। (মিরক্বাত)

হযুর এরশাদ করেন, “তোমার রব যা অপছন্দ করেন তা-ই তুমি বর্জন করবে”। হারাম, মাকরুহ-ই তাহরীমী, মাকরুহ-ই তানযীহী-সব ক’টি থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, এসব হচ্ছে সর্বোচ্চ হিজরত। স্মর্তব্য যে, যা হযুরের কাছে অপছন্দনীয়, তা আল্লাহ’র কাছেও অপছন্দনীয়।

তিনি বললেন, আমি আরয় করলাম, “কোন জিহাদ উত্তম?” এরশাদ করলেন, “যারা ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হবে এবং সেটার রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া হবে”। অর্থাৎ মুজাহিদ জিহাদের ময়দান হতে না প্রাণটি নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন, না সম্পদ। গণীমতের প্রশ্নই তো আসে না। জিহাদে যে পরিমাণ কষ্ট অধিক হবে সে পরিমাণ সাওয়ারও বেশি হবে। তিনি বললেন, আমি আরয় করলাম- “কোন সময়টি উত্তম?” অর্থাৎ নফলের জন্য কোন সময় উত্তম? ফরয নামাযগুলোর ওয়াক্বূত নিয়ে প্রশ্নই করা হয় নি। যেমনটি উত্তর হতে বুঝা যাচ্ছে। এরশাদ করলেন, “শেষ রাতের মধ্যম অংশ”। অর্থাৎ রাতের শেষ তৃতীয়াংশকে তিনভাগ করো। সেটার মধ্যম অংশে তাহাজ্জুদ পড়ো। রাতের শেষ ষষ্ঠমাংশের ওই সময়েই সাহরী খাওয়া, দো’আ-প্রার্থনা করা, বরং ক্ষমা প্রার্থনা করা উত্তম। কেননা ওই সময় রহমত-ই ইলাহী পৃথিবীর দিকে বেশি ধাবিত হয় এবং ওই সময় জাহ্নত হওয়া নাফসের জন্য কষ্টদায়ক।

অর্থাৎ- শেষ রাতে মহান রবের রহমত ঘরে ঘরে আওয়াজ দেয়- হে ঘুমন্ত লোকেরা! হে রব! হে রব! বলে ডেকে নাও। তাঁর দরজা খোলা রয়েছে।



‘আশুরা’ আরবী শব্দ। সাধারণতঃ আশুরা বলতে প্রতি চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস মুহররমের দশম দিবসই বুঝায়। ইসলামী হিজরী সন মুহররম মাস হতে শুরু। পৃথিবীর আদি ইতিহাসের বহু ঘটনা এ মহররম মাসের দশম তারিখে অর্থাৎ ‘আশুরা’ দিনে সংঘটিত হয়। তাই এ দিনটি যেমন ঐতিহাসিক, বরকতপূর্ণ তেমনি বিস্ময়কর ও বিয়োগান্তক। তাই এ দিবসটা মুসলমানগণ অতীব গুরুত্ব সহকারে পালন করে আসছে। রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিনটা উদযাপনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিম্নে এ মহান দিবসটির (আশুরা) বৈশিষ্ট সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল:

১। আল্লাহ পাক মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) কে এবং হযরত মা হাওয়া (আ.)কে বেহেশতেই সর্বপ্রথম অবস্থান করার সৌভাগ্য দান করেন। সেখানে অবস্থানকালে শয়তানের প্ররোচনায় বেহেশতের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে এ ধরার ধুলায় আগমণ করেন এবং তিনশত বৎসর কান্নাকাটির পরে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওহিলায় হযরত আদম (আ.) এর তওবা আল্লাহ পাক কবুল করেন এবং এ তওবা কবুলের দিবসটি ছিল মাহে মুহররমের দশম তারিখ বা আশুরা।

২। হযরত ইদ্রিস (আ.) এ আশুরা দিবসেই বেহেশতে প্রবেশ করেন।

৩। হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বৎসর তাঁর উম্মতদের হেদায়েত এর পর তাঁর ডাকে সাড়া দিতে

আপত্তির কারণে আত্মাহ তা’লার পক্ষ হতে অবাধ্য উম্মতদের তুফান ও প্রলয় দ্বারা ধ্বংস করা হয়- কিন্তু তিনি ও তাঁর অনুশারী উম্মতগণ সে কালখাসী প্রলয় থেকে ‘কিস্তির’ মধ্যে অবস্থান করে রক্ষা পান এ ঐতিহাসিক আশুরার দিনে।

৪। এ আশুরা দিবসেই হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে আল্লাহ পাক “খলিলুল্লাহ” বা আল্লাহর বন্ধু বলে ঘোষণা করেন এবং এ দিবসেই হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর জন্য খোদাদ্রোহী নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে সুশীতল করে ফুলের মনোরম বাগিচার পরিণত করা হয়েছিল।

৫। হযরত মুছা (আ.) আল্লাহপাক এর সাথে কথোপকথনের মর্যাদা এবং তাঁর প্রতি আসমানী কিতাব “তাওরীত” লাভ করেছিলেন এ দিনে।

৬। এ মহান দিবসে হযরত আইউব (আ.) কঠিন পীড়া কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন।

৭। হযরত ইউছুফ (আ.) তাঁর ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিষ্কিণ্ড অন্ধকার কূপ হতে রক্ষা পান।

৮। হযরত ইউনুছ (আ.) মাছের পেট এবং অতল সমুদ্রের মহা বিপদ থেকে রক্ষা পান।

৯। ফেরাউনের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে হযরত মুছা (আ.) এবং তাঁর দলবল বনী ইস্রাইলকে নীল নদের উপর গুরু রাস্তার দিয়ে হেটে অপর পারে পৌছেন এবং ফেরাউন ও তার সাথী সঙ্গীরা ঐ রাস্তা অতিক্রম করার সময় পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১০। হযরত দাউদ (আ.) এর তাওবা এ দিনেই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

১১। হযরত সোলায়মান (আ.) তাঁর হারানো আংটি এবং সাম্রাজ্য এ মহান দিবসে পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

১২। হযরত ইসা (আ.) এর জন্ম হয়েছিল এবং তার প্রতি বনী ইসরাঈলদের অন্যায় আচরণের কারণে আল্লাপাক তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছিলেন এ দিনেই।

এ ছাড়াও এ পৃথিবীর অস্তিত্বের সাথে “আশুরা” দিবস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা আল্লাহ পাক এ মহান দিবসেই আসমান, জমিন, লাওহ, কলম সৃষ্টি করেছেন এবং এ কারণেই সৃষ্টির সাথে যেমন এ দিনের সম্পর্ক

রয়েছে তেমনি লয় এর সাথেও এর সম্পর্ক বিদ্যমান কেননা এ মহান দিবসেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

উক্ত মহান দিবসের সাথে বিজরিত রয়েছে হিজরী ৬১ সনে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা যা চিহ্নিত হয়েছে শহীদী রক্তের মর্যাদারমাপ কাঠিতে। এ অসমযুদ্ধ ছিল অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জুলুম এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং এক অনন্য সাধারণ মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বহিঃ প্রকাশ। শাহাদাতের অমিয় সুখা-পান করেন নিজের এবং পরিবার পরিজনের জান কোরবান করে হযরত ইমাম হোছাইন (র.) শহীদী জীবনের মহিমামস্তি নেতৃত্বের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি অন্যায় এর কাছে মাথা নত করেন নি। বর্তমান এ অশান্ত মুসলিম জাহানে সেই জেহাদী প্রেরণায় অনুপ্রানিত হয়ে হযরত ইমাম হোছাইনের (র.) ন্যায়ের প্রতীককে পাথেয় করে আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। অন্যায় বাতিল-ফেরকা লা মাজহাবী ওহাবী, তাবলীগি, মওদুদী ও কাদিয়ানীরা বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন দিয়ে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করার অর্থ প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রত্যেক আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত পন্থীদের নৈতিক দায়িত্ব। ঈমান-আকিদা বিরোধী কার্যকলাপ, বন্ধ করা সহ যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে ইসলামের ক্ষতির কাজে লিপ্ত তাদেরকে রুখতে হবে। ন্যায় এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে বাতিল ফেরকা, লা-মাজহাবী কর্মকাণ্ডে মুসলমানের দারিদ্রতার সুযোগে খৃষ্টান মিনারীদের অপ-তৎপরতা, জালিমের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তৎপর হতে হবে এবং এখানেই নিহিত রয়েছে আশুরা তথা কারবালার মহান শিক্ষা।

ইসলামের ইতিহাসখ্যাত মধ্য এশিয়ান সুন্নী অধ্যুষিত ইরাকের ফোরাতে নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর পুত্র ছুরাচার মরদুদ এজিদের বিপুল সৈন্য বাহিনীর সাথে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর হাতে গোনা সফর সাথীদের এক অসম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলাফলের দিক দিয়ে এ সম যুদ্ধ ছিল অতি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। এ যুদ্ধের ফলে উমাইয়া বংশের পতন যেমন অত্যাশ্চর্য হয়েছিল তেমনি

অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, ‘কারবালার এ বিয়োগান্ত ঘটনা কেবল খেলাফতের ভাগ্যই নির্ধারণ করেন নি, ইহা খিলাফত ধ্বংসের অনেক পরে মুসলিম জাহানের ভাগ্য ও নির্ধারণ করেছিল।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) জানতেন যে কারবালা প্রান্তরে এ বিয়োগান্ত ঘটনায় দুরাচার এজিদের ত্রিশ হাজার সৈন্য বাহিনীর হাতে তিনি নির্মমভাবে শাহদাত বরণ করবেন। তবুও তিনি ইসলামী আদর্শ এবং খিলাফতী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পিছপা না হয়ে মহান আল্লাহর রাহে তেজোদীপ্ত এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে নির্ভীক সত্যের এবং ন্যায়ের আদর্শ সৈনিক হিসেবে পা বাড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সত্য এবং ন্যায় বলতে আর কিছুই বাকী নেই। পবিত্র এবং শ্বাসত ইসলাম বিপন্ন। এমতাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে জেহাদ করে প্রাণ বিসর্জন দেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। “আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি জালিমের যুগে বেঁচে থাকাও মহাপাপ”। এটাই ইসলামের মহান শিক্ষা। হযরত ইমাম হোছাইন (র.) তার বিপ্লবী শহীদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যথাযথ সত্যতার এক অনুপম, সাবলীল, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে রেখে গেছেন যা রক্তের অক্ষরে লেখা এক নজির বিহীন উপমা।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং এখন ও হচ্ছে কিন্তু সকল পাখিব ঐশ্বর্য্য, ভোগ বিলাসিতাকে বিসর্জন দিয়ে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আপন পরিবার পরিজন বেষ্টিত মাছুম বাচ্চাসহ অতি প্রিয় সাথী সুহৃদদের জীবন উৎসর্গের এমন উজ্জ্বল কোন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হযরত ইয়াল্লা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রসুলে করিম (দ.) এরশাদ করেছেন, “হোছাইন (র.) আমার এবং আমি হোসাইন (রা.) আমার এবং আমি হোসাইন (রা.) এর। যে ব্যক্তি আমার হোছাইন (র.) কে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে আর সে বদনহীব যে হোছাইন (র.) এর সাথে শত্রুতা রাখে সে আমার সাথেও শত্রুতা রাখে”।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি (র.) এর খিলাফত কালে হযরত আমির মুয়াবিয়া (র.) সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। ৪র্থ খলিফা হযরত আলী (ক.) এর ওফাতের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইমাম হাসান (র.) হযরত আমিরে মুয়াবিয়া (র.) এর সাথে এ শর্তে আপোষ করেন যে তিনি (হযরত মুয়াবিয়া (র.)) যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি খলিফা থাকবেন এবং তাঁর ওফাতের পর হযরত ইমাম হাসান (র.) খলিফা হবেন। আমিরে মুয়াবিয়া (র.) এর ওফাতের পরে তদীয়পুত্র দুরাচার এজিদ নিজেকে দামেস্কের খলিফা হিসেবে ঘোষণা দিলেন এবং বিভিন্ন অপকৌশল ও চলচাতুরির মাধ্যমে হযরত ইমাম হাসান (র.) কে খিলাফতের পথ হতে সরিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে শঠতাপূর্বক বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন।

হযরত ইমাম হাসান (র.) এর ওফাতের পরে তখন সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে এজিদের ইসলামী রাষ্ট্রনীতির বরখেলাপের কারণে হযরত ইমাম হোছাইন (র.) প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ঐদিকে কুফাবাসী হযরত হোছাইন (র.) কে এজিদের বিভিন্ন মুখী ইসলামী রীতিনীতি বিগর্হিত কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দ্বীন ও শরীয়ত রক্ষার্থে তাঁকে কুফার আগমনের আহ্বান জানায়। হযরত ইমাম হোছাইন (র.) আপন পিতৃব্য হযরত ইমাম মোসলেম (র.)কে কুফার সম্যক অবস্থা অবলোকনের জন্য কুফার পাঠালেন, ত্রিশ হাজার কুফাবাসী হযরত ইমাম হোছাইন (র.) এর পক্ষে হযরত ইমাম মোসলেম (র.) এর হাতে বয়াত গ্রহণ করলেন এবং তিনি এ বয়াতের সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে কুফা আগমনের আহ্বান জানালেন। হযরত ইমাম হোসাইন (র.) তাঁর পরিবারবর্গ সমেত ৭২/৮২ জনের এক কাফেলা কুফার পথে রওয়ানা হলেন। পথে তিনি হযরত মুসলিমের (রা.) হত্যার খবর ফেলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে তিনি কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের পাঠানো ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার সৈন্য কর্তৃক বাঁধা প্রাপ্ত হলেন। তারা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর পরিবার পরিজনসহ সাথী সঙ্গীদের কুফার ঢুকতে দিল না। তখন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, (১) তোমরা আমাকে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন

করতে দাও, অথবা (২) আমাকে এজিদের নিকট যেতে দাও। অথবা (৩) আমাকে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যেতে দাও। কিন্তু এজিদের সৈন্যরা তাঁর কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করলোনা। কোন উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি (রা.) জেহাদে অবতীর্ণ হলেন। ঐ দিকে ফোরাতে নদীর পানি তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা একে একে বীর বিক্রমে জালেম শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর পবিত্র দেহের তাজা রক্ত প্রবাহিত হলো কারবালার মরু প্রান্তরে। এ ভাবে তিনি সত্যের ও ন্যায়ের জন্য আমরণ সংগ্রাম করার এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন।

শৈরচারী ও চরিত্রহীন এজিদ ধিকৃত হয়ে আসলেও একদল তথাকথিত মুসলমান এ মহান জিহাদকে কখনো রাজনৈতিক বা স্বার্থপর, আবার কখনো বাড়াবাড়ি বলে মন্তব্য করে থাকে। আসলে ঐ সকল মুখোশ পরা পথভ্রান্ত মুসলমান ঈমান ও আকিদার পরিপন্থী কাজ করছে এবং জেহাদের অবমূল্যায়ন করতঃ দ্বীন ইসলাম ও শরীয়ত এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবী করছে। আজকের এ দিনে আল্লাহ তা'লার নিকট আমাদের আরজ হবে, তিনি (আল্লাহ) যেন ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী ধূর্ত নাফরমানদের হাত থেকে নিরীহ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হেফাজত করেন। আমীন। সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত এবং আজকের দিনে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নীতি বিরুদ্ধ সকল কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করি। যে নীতি ও আদেশের জন্য আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৌহিত্র শাহাদাত বরণকরলেন সে লক্ষ্যে আজকে যদি আমরা জেহাদে অবতীর্ণ হতে পারি তাহলেই হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহ আমাদের জেহাদী মনোবল বৃদ্ধি করুন। আমীন। হুন্মা আমীন।

মুহাম্মদ ও আহমদ নামের তাৎপর্য

মূল:- (ফার্সী) হযরত মাওলানা শাহুওয়ালী উল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে তরজমা ও তাশরিহ (উর্দু) মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী

বঙ্গানুবাদ: মুহাম্মদ হারিছুর রহমান কাদেরী (আনোয়ারী)

খতিব, মাদারটেক বাজার মসজিদ, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلی
على رسوله الكريم -

সাধারণত অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক রাখার উদ্দেশ্যেই কোন কিছুর নামকরণ করা হয়। এজন্যই কোন কিছুর নাম তার যাবতীয় গুণাবলীর সাথে পরস্পর সম্পর্কিত থাকা অত্যাবশ্যকীয় নয়। ঘটনাক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্কিতও দেখা যায় তবে খুবই বিরল। কিন্তু এরূপ তো কখনও দেখা যায়না যে, কোন ব্যক্তির এমন নাম রাখা হয় যা স্বীয় নামকরণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা তার সারা জীবনের দর্পন স্বরূপ। আশিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুহ ছালামগণের সম্মানিত নাম সমূহই দেখা যাক, তাদের মধ্য থেকে কারো নাম এরূপ পাওয়া যাবে না যে, ঐ নামই স্বীয় নামকরণের কামালতে নবুয়তের যথোচিত সাক্ষ্য প্রদানকারী।

যথা: آدم আদম: আদম শব্দের অর্থ গম বর্ণ (লাবন্যময়) আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিহি ছালামের এ নাম তাঁর শারিরীক বর্ণ প্রকাশ করছে।

নূহ: نوح নূহ শব্দের অর্থ আরাম (উপশম) পিতা তাঁকে আরামও শান্তির কারণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইসাহাক: اسحاق ইসাহাক শব্দের অর্থ হাস্যকারী তিনি হাসি খুশি অবয়ব বিশিষ্ট ছিলেন।

ইয়াকুব: ইয়াকুব শব্দের অর্থ পশ্চাদে আগত ব্যক্তি, তিনি স্বীয় ভাই ঈসুর সাথে জমজ পয়দা হয়েছেন।

মূছা: موسى মূছা, শব্দের অর্থ পানি থেকে বহিরাগত। যখন তাঁর সিন্দুক পানি থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়

তখন তার এই নাম রাখা হয়।

ইয়াহুইয়া- يحيى ইয়াহুইয়া শব্দের একমাত্র অর্থ দীর্ঘায়ু। বৃদ্ধ পিতা মাতার কল্যাণকামনার একমাত্র ফসল।

ঈসা: عيسى ঈসা শব্দের অর্থ লাল বর্ণ, অতীব সুন্দর মুখশ্রীর কারণে এ নাম রাখা হয়। উল্লেখিত নাম সমূহ দেখুন এবং তাদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখবেন কোন মতেই ঐ সম্মানিত বুজর্গদের রুহানী আজমত বা আত্মিক সম্মান ও শানে নবুয়তের প্রতি ইঙ্গিত বহন করেনা। কিন্তু পবিত্র নাম মহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্তবা ভিন্নরূপ। হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত দাদা হযরত আব্দুল মোস্তালীব তাঁর এ পবিত্র মুবারক নাম রাখেন মুহাম্মদ।

এই আশায় যে পৃথিবীতে তাঁর প্রশংসা করা হবে। ছাইয়েদেনা নাবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে এ নামের প্রচলন ছিল খুবই বিরল। কোন কোন ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন যে, হুজুরে পাকের পূর্বে দুনিয়াতে সর্বমোট সাত জনের এ নাম রাখা হয়েছিল।

নবী দোজাহার দাদা হযরত আব্দুল মোস্তালিবের চিন্তাধারায় এ পবিত্র নাম মুবারক উদিত হওয়া আল্লাহ জাল্লা জালালুল এক বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

মুহাম্মদ ও আহমাদ উভয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাতী নাম, মুহাম্মাদ হাম্মাদ-এর সিগা হতে মুবালেগা। অর্থাৎ বার বার যার প্রশংসা ও তারিফ করা হয়। যার প্রশংসার ছিলছিল কখনও শেষ হয় না। কেবল যার গুণ গান বয়ান হতেই থাকে তিনিই “মুহাম্মদ”। নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি যে, যুগ যত বেড়ে চলছে মানব জাতি স্বীয় চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে ততো উন্নতির সোপানে আরোহন করছে। কেবল আকিদাতান বা বিশ্বাসগতভাবেই নয় বরং বাস্তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কামালতের (পূর্ণতার) পর্দা বিকশিত হচ্ছে। আর মানব জগত ও দিন দিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছে। যেন বিশ্বজগতে এক ধর্ম ইসলাম ও এই ধর্মের একক মোযেজা অতীব সম্মানিত নাম মুবারক চৌদশত বৎসর

পূর্ব হতে এই যুগে আগন্তুকদেরকে নেঘাহবাণী করে আসছে। ভবিষ্যতে দুনিয়া যত দীর্ঘায়ু হবে নবুয়তে মুহাম্মদিয়ার কামালত ততো ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে। এ পর্যায়ে বরকতময় নামের অর্থ এই হয় যে, উহা এমন এক সত্য যার তারিফ প্রশংসা উত্তম গুণাবলী সর্বদা বর্ণনা হয়।

ছায়েদুল আমিয়া হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জগতেও অতীব প্রশংসিত, আমিয়ায়ে কেরামগণের নিকটও প্রশংসিত, আকাশবাসীদের নিকটও প্রশংসিত জমিনবাসীদের নিকটও প্রশংসিত। ইয়া একমাত্র হুজুরই মাকামে মাহমুদের অধিকারী লেওয়ালিল হামদ (প্রশংসার পতাকা) একমাত্র হুজুরে পাকেরই শাহী বাভা। আর হুজুরে পাকের উম্মতের নাম ও হাম্মাদুন বা অত্যাধিক প্রশংসাকারীদল। ‘মুহাম্মদ’ এমন এক পবিত্র জাত (সত্তা) সকল জমীন ও আকাশবাসী সব কিছুই উর্ধে যার প্রশংসা করে থাকে। “আহমেদ” এমন এক সত্তা যিনি সকল আকাশবাসী ও জমীনবাসীদের প্রশংসা অপেক্ষা আকাশ সমুহ ও জমীনের প্রতি পালকের অত্যাধিক প্রশংসা করে থাকেন। ইহা এমন এক বৈশিষ্ট পূর্ণ নাম যা অন্যান্য নবীগণের নাম মুবারকে নেই।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জাল্লা শানুহু অতীব পবিত্র যিনি স্বীয় হাবিবে পাকের এরূপ বরকতময় নাম রেখেছেন এবং সেই নবী পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছে তাকে রাবুল আলামিন এইরূপ ফজিলতের অধিকারী করেছেন।

এখন একটু সত্য নয়নে অবলোকন করুন। রাছুলে পাকের সাথে আল্লাহুতালার কি নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

(১) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতার নাম হযরত আব্দুল্লাহু রাদি আল্লাহু আনহু রাছুলে পাকের উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান:- তোমাদের নাম সমূহের মধ্য থেকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহু ও আব্দুর রহমান।

(২) তাজেদারে মদিনা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিতা মাতার নাম হযরত আমেনা রাদিআল্লাহু আনহা امن - امان থেকে নির্গত এবং

ایمان ঈমানের সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত।

(৩) বুর্জগ দাদা হযরত আব্দুল মোত্তালীব এক পাক পবিত্র থেকে (নির্গত) মুহাম্মাদ আহমদ ও মাহমুদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় হওয়ার ইশারা ছিল।

(৪) সম্মানিত দাদী ফাতেমা বিনতে আমর ইবনে আয়েজ এ পবিত্র নামের সৌন্দর্য্য সূর্য্য হতেও অত্যাধিক প্রকাশ্য।

(৫) হুজুরে পাকের সম্মানিত নানার নাম ওহাব- যার অর্থ দান, বখসিস ইত্যাদি।

(৬) তাঁর বংশের নাম বনী যোহরা যার ভাবার্থ চমক বা আলো।

(৭) সম্মানিত নানী সহেবাণীর নাম হযরত বাররা যার অর্থ নেককার।

দুধ মাতাগণের প্রতিলক্ষ্য করুন!

(১) ‘হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম দুধ পান করিয়েছেন হযরত ছোয়াইবাহ ثواب থেকে নির্গত যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্ত মহিলা।

(২) হযরত হালিমা বিনতে আব্দুল্লাহু ইবনে হারেছ حلم থেকে হালিমা নির্গত যার অর্থ হচ্ছে ধৈর্য্যশীলা।

(৩) হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ মাতা হযরত হালিমার স্বামীর নাম হারেছ সায়াদী তিনি ও ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নবী পাকের সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হাদীছ শরীফে রয়েছে সকল নাম হতে অত্যাধিক সত্য নাম হয়েছে হারেছ ও হামাম

(৪) হুজুরে পাকের দুধভাই যার জন্য হুজুর রাহমাতুল্লিল আলামিন চুপে পেস্তান ছেড়ে দিতেন, আব্দুল্লাহু সায়াদী তিনিও ইসলামে দীক্ষিত হয়ে সাহাবীর মর্য্যাদা লাভ করেন।

(৫) হুজুরে পাকের বড় দুধ বোন যিনি হুজুরকে কোলে নিয়ে খেলা করতেন এবং হুজুরকে বুকে রেখে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন সায়্যেমা সায়াদীয়া অর্থাৎ নিশানধারিণী, যা দূর থেকে চমকিত হয়। তিনিও মুসলমান হয়ে সাহাবীর মর্য্যাদা লাভ করেন।

(৬) একদা হযরত হালিমা রাদিআল্লাহু আনহা হুজুর পুন নূরকে কোলে নিয়ে পথ চলাতে ছিলেন। তিনজন কুমারী

মেয়ে হুজুরের খোদা প্রীতি অবয়ব দেখে অত্যাধিক মহবতে স্বপ্ন পেস্তান হুজুরে পাকের পবিত্র মুখে রাখেন এবং প্রত্যেকের পেস্তান থেকে দুধ নির্গত হয়, এই পবিত্র তিন কুমারীর নাম ছিল আতেকা, আতেকাশন্দের অর্থ- ভদ্রমহিলা, সম্মানিতা, সর্দারিণী, আপাদমস্তক আতর মিশ্রিত।

(৭) তিন জনই বণী ছালিম গোত্রের ছিলেন। سلامت থেকে নির্গত এবং 'ইসলাম' শব্দের সাথেও ওতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছে। ইবনে আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সকল রমণীগণ দুধপান করিয়েছেন তার সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

নবীয়ে দোঁজাহা তাদের শানে বলেন আমার মার পরে তোমরাও আমার মা, হিজরতের পথে তাদের পানি পিপাসা হলে, আকাশ থেকে নুরানী রশিতে একটি পানি পূর্ণ বালতি অবতীর্ণ হয় এবং তারা ঐ পানি পান করে তৃপ্ত হন। ইহার পর থেকে তারা আর কখনও পিপাসা অনুভব করেননি। প্রচণ্ড পরমের দিনেও রোজা রেখেছেন, কিন্তু পানির পিপাসা লাগেনি।

জন্ম হওয়ার সময় যারা রাছুলে করিমকে স্বীয় হস্তে ধারণ করেন। তাদের পবিত্র নাম দেখুন- شفاء শোফা- ইনি হযরত আব্দুল রহমান ইবনে আউফ রাদিআল্লাহু আনহুর সম্মানিত মা বুর্জগ সাহীবীয়াহ।

ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ বিন সাকাফিয়া- ইনিও একজন সম্মানিতা সাহাবীয়াহ রাদি আল্লাহু আনহা ইনসাফের দৃষ্টিতে বলুন। যে মুবারক পেটে রাছুলে করিম রাহমাতুল্লিলি আলামিন তাশরিফ এনছেন স্বীয় পা মুবারক বিস্তার করেছেন যে পুত্র পবিত্র রক্ত মুবারক থেকে এ নুরানী দেহের অংশ পয়দা হয়েছে। তাদের শান ও মর্যাদা কিরূপ হতে পারে অবশ্যই হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতা মাতা এবং পবিত্র বাপ দাদাগণ এবং পবিত্রা মা প্রত্যেকেই ঈমানদার ও মোয়াহেদীন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহাই প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণের মত।

মুহাম্মদ ও আহমদ নামের ফাজায়েলে কয়েকটি হাদীছ (১) যার ছেলে জন্ম হয় এবং আমার মুহাব্বত ও আমার নামে পাকের বরকত হাসেলের উদ্দেশ্যে তার নাম মুহাম্মদ রাখে তবে সে ব্যক্তি ও তার ছেলে উভয়ই

বেহেশ্তী হবে।

(২) আল্লাহ জান্না জালালুহ তাঁর ইজ্জতের কসম খেয়ে আমাকে বলেছেন যার নাম তোমার নামে হবে অর্থাৎ মুহাম্মাদ বা আহমদ তাকে দোজখের শাস্তি দেবনা।

(৩) রোজ হাসরে দুই ব্যক্তিকে আল্লাহুতালার সামনে হাজির করা হবে। বলা হবে এদেরকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও, তারা আরজ করবে ইয়া এলাহী আমরা কোন আমলের দরুন বেহেশ্তের উপযুক্ত হয়েছি। আমরাতো বেহেশ্তের কোন আমল (কাজ) করিনি। রাবুল আলামিন বলবেন: বেহেশ্তে যাও কেননা আমি কসম খেয়ে বলেছিলাম যে যার নাম মুহাম্মাদ অথবা আহমেদ রাখা হবে সে দোজখে যাবেনা। অর্থাৎ- যদি ঐ ব্যক্তিগণ মোমেন হন। কোরআন ও হাদীছ শরীফের মর্মানুসারে মোমেন সেই ব্যক্তি যিনি ছুন্নী ছহিহ আকিদা পোষণকারী। অন্যথায় মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারিরা জাহান্নামের কুকুর। এদের কোন আমল আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণ যোগ্য নয়।

(৪) যে ঘরে এই পবিত্র নাম সমূহের নামের কোন ব্যক্তি থাকে সে ঘরে প্রত্যহ দুইবার আল্লাহপাকের রহমত নাজেল হয়।

(৫) যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শের জন্য (সার সংক্ষেপ) একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে কারো নাম মুহাম্মাদ থাকে আর তাকে যদি তাদের পরামর্শে শামিল না রাখে তবে উক্ত পরামর্শে কোর বরকত থাকবে না।

(৬) যার তিন ছেলে থাকা সত্যেও কারো নাম মুহাম্মদ রাখলনা সে নিতান্তই জাহেল (মূর্খ)।

(৭) যখন ছেলে নাম মুহাম্মদ রাখ তখন তাকে সম্মান কর এবং মজলিসে তার জন্য প্রসস্ত স্থান রাখ। আর তাকে কোন মন্দের দিকে সম্বন্ধ করোনা ও তার উপর বদ দোয়া করোনা। (আকায়েদুল ইসলাম)

الصلوة السلام عليك يا رسول الله

الصلوة السلام عليك يا حبيب الله

الصلوة السلام عليك يا نبي الله وعلى

الك واصحابك يا نور الله

মোজাদ্দের কাকে বলে? প্রতি শতকের মোজাদ্দের কে কে ছিলেন?

মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ হোসাইন আল কাদেরী

পবিত্র হাদীসে মোজাদ্দের বৈশিষ্ট্য:

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর ধর্মের মধ্যে কিছু কুসংস্কার ও বাতিল আকিদার সৃষ্টি হবে। সৃষ্ট কুসংস্কার ও বাতিল মতবাদ থেকে দ্বীনকে রক্ষা করা-তথা ঈমান আমলের সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতি হিজরী শতাব্দীর শেষ মাথায় মোজাদ্দের আবির্ভাব হবে- যিনি পরবর্তী হিজরীর প্রথম ভাগে তাঁর/তাদের সংস্কার কাজের স্বীকৃতি লাভ করবেন। দুই শতাব্দীর না পেলে তাঁকে মোজাদ্দিদ বলা যাবে না। মোজাদ্দিদ হাদীস খানা নিম্নরূপ:

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة من
يجدد لها دينها -

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর শেষ মাথায় এমন সব ব্যক্তি প্রেরণ করেন- যারা উম্মতের মঙ্গলের জন্য তাদের দ্বীনকে পুনর্জীবিত করবেন।

মোজাদ্দের সংজ্ঞা:

“সিরাজুমুনুরা” নামক গ্রন্থে মোজাদ্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

معنى التجديد الاحياء مما اندرس من العمل
بالكتاب السنة والامر بمقتضاها -

অর্থ- দ্বীনের সংস্কার (তাজদীদ) বলতে বুঝায় কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে জীবন ব্যবস্থা নিভু নিভু প্রায় সেটাকে জিইয়ে রাখা, এবং পুনরায়; কোরআন সুন্নাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লামা মানাতী (রাহ.) মোজাদ্দের সংজ্ঞায় লিখেছেন-

يبين السنة من البدعة ويذل اهلها

উচ্চারণ: ইউবায়িনুস সুন্নাতি মিনাল বিদআতে ওয়া ইয়াজলু আহলুহা।

অর্থ- মোজাদ্দের হলো- যিনি সুন্নাতে রাসুল (দ.) কে বেদআত হতে পৃথক করবেন এবং বেদআয়াতি সম্প্রদায়কে উৎখাত করবেন। ওলামায়ে কেরামদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মোজাদ্দের কাজ হলো সুন্নাতে কে বেদআত হতে, হেদায়াতকে ভ্রষ্টতা হতে পৃথক করা, শরীয়তের পথ প্রদর্শনে সাহায্য সহযোগিতা করা, পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে মাথানত করানো এবং তাদেরকে দমন করা। মোজাদ্দের কাজ হলো ডাক্তারের মতো। পার্থক্য হলো এই যে, মোজাদ্দের অন্তরের রোগ বালাই কে বিদূরিত করেন। ডাক্তাররা বাহিরের চিকিৎসা করেন।

মোজাদ্দের গণের তালিকা ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:

প্রথম শতাব্দীর মোজাদ্দের:

হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (রহ.)। তিনি হিজরীর প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার ওফাত হয় ১১২ হিজরীতে। তিনি তার শতাব্দীর ১২ বছর পান। খারেজি সম্প্রদায়ের যাবতীয় ষড়যন্ত্র-এর মূলোৎপাটন সহ যাবতীয় বাতুলতার অবসান ঘটিয়ে তিনি চির শ্বশত ইসলামের দ্বীপ্তিকে পুনঃ উদ্ভাসিত করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দিদ:

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। তিনি সেই সময়কার মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের ভাস্ত চিন্তাধারা ও বিকৃত মানসিকতার উচ্ছেদ করেন। তিনি ৭০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। ২৩০ হিজরীতে তার ওফাত হয়। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এই শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করলেও দ্বীনের তাজদীদের খেদমত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নসীব হয়েছিল।

তৃতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দিদ:

ইমাম আহমদ নাসায়ী (রহ.)। তিনি ২৭০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বাতিল আকীদা সমূহের গোড়া উৎপাটন পূর্বক তিনি ‘মোজাদ্দিদ’ উপাদিতে ভূষিত হন। তিনি ৩৪০ হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্ত হন।

চতুর্থ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ:

রাফেয়ী সম্প্রদায়ের ভন্ড মুখোশ উন্নাচন পূর্বক মুসলিম মিল্লাতকে তাদের ভ্রান্ত আকীদা হতে রক্ষা সহ তেহরান

ও লেবাননে ইসলামী ঝাড়া উড্ডীয়মান করতে দু'জন সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব- যথাক্রমে হযরত ইমাম বায়হাকী (রহ.) ও হযরত ইমাম বাকিল্লানী (রহ.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তন্মধ্যে ইমাম বায়হাকী (রহ.) তৃতীয় শতাব্দীর ২০ বছর ও চতুর্থ শতাব্দীর ৪২ বছর এবং হযরত বাকিল্লানী (রহ.) তৃতীয় শতাব্দীর ২৪ বছর ও ৪র্থ শতাব্দীর ৫৫ বছর পেয়েছিলেন।

পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

ইমাম গাজ্জালী। তাঁর জন্ম ৪৭০ হিজরী সনে। তিনি কদরিয়া সম্প্রদায়ের ঈমান বিধ্বংসী থাবা হতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈমান ও আকীদার সংরক্ষণ করেন। ৫৬০ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)। তিনি জহমিয়া সম্প্রদায় এবং গ্রীক দর্শনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেন। গ্রীক দার্শনিকদের পৃথিবী স্থাশত ও চিরন্তন হওয়া অমূলক ধারণা সহ সকল বাতিল আকিদা ও কুফরী উজ্জিতে ইসলামী দর্শনের অভ্রান্ত, অখণ্ডনীয় যুক্তিনির্ভর তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা খন্ডন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

ইমাম তকীউদ্দিন ইবনে দকী আবদারী (রহ.)। তিনি ৬৭৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুস্তানের অনেক এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। আর একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন ইমাম তকীউদ্দিন সুবকী।

তিনি ৬২৭ হিজরীতে মিশরে ইস্তিকাল করেন। তিনি ইবনে তাইমিয়ার বাতিল ওহাবী মতবাদ খন্ডন করেন। তিনিই মিলাদের কিয়াম ব্যাপক প্রচলন করেন। তিনি একাধারে মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ ছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.)। তিনি ৮১৫ হিজরী সনে ৩৬ বছর বয়সে ইস্তিকাল করেন। তিনি স্বীয় শতাব্দীর ১৫ বছর পেয়েছেন। তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা করে লা মাহাবীদের বাতিল মতবাদ প্রতিহত করেন।

নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

গ্রীক দর্শনের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এই দর্শনের ভান্ডির কবল থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার্থে এই শতাব্দীতে

আগমন করেন প্রখ্যাত মোফাচেছর, আন্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী (রহ.)।

দশম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)। তিনি বাদশাহ আকবরের দ্বীনে এলাহীর স্বরূপ উন্মোচন করেন এবং যাবতীয় অপশক্তির প্রতিরোধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।

একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসন পদ্ধতির বিরোধীতা করণ এবং মুসলমানদের যাবতীয় কল্যাণ সাধনে ৯৭১ হিজরীর ১০ই মাহররম জন্ম গ্রহণ করেন হযরত শেখ আহমদ ফারুকী শেরহিন্দী (রহ.)। ১০৩৪ হিজরীর ২৮ শে সফর তাঁর ওফাত হয়। তিনি দ্বীনে এলাহী খন্ডন করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

ইমাম মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব শাহেনশাহে হিন্দ। যঁার জন্ম ১০২৮ হিজরী সনে। তাঁর পুরো জীবনটাই তিনি ধর্মত্যাগী মুরতাদ, খোদাদ্রোহী, বাতিলশক্তির মোকাবেলায় অতিবাহিত করেন। ১১১৭ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

হযরত শাহ আবদুল আজীজ (রহ.)। ১১৫৯ হিজরীতে জন্ম, ১২৩৯ হিজরীতে ওফাত তিনি ভারতের ওহাবী আকিদাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং ইসমাঈল দেহলভীকে তার বদ আকিদার কারণে মিরাস থেকে বঞ্চিত করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ:

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাজেলে বেরেলভী (রা.)। তিনি ১২৭২ হিজরীতে ১০ই শাওয়াল জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৪০ হিজরীর ২৫শে সফর ওফাত প্রাপ্ত হন।

তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ২৮ বছর ২ মাস ২০ দিন পেয়েছেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর ৩৯ বছর ১ মাস ২৫ দিন পেয়েছেন। তিনি ওহাবী, নজদী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, শিয়া সহ সকল বাতিল অপশক্তির বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার কঠোর ছিলেন। তিনিই সুন্নী মতবাদকে পুনর্জীবিত করেন। তাই তাঁকে ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলা হয়।

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ হামেদ রেযা খান বেরেলী (রহঃ) মুফতী আবু ছাফওয়ান মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ

চৌদ্দশ শতাব্দীর সফল মোজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, আ'লা হযরত, আজিমুল বারাকাত, তাজুশ শারিয়াত, কানযুল কারামত জবলে ইস্তেক্বামত, সমন্দরে ইলম ও হিকমত আল্লামা হাফিজ, ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রেযাখান কাদেরী, হানাফী মুহাদ্দিসে বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি বড় ছাহেবজাদা হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম মজহারে আ'লা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হামেদ রেযাখান বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি। যিনি তখন কার সময়ে বিজ্ঞ আলিমেন্দীন, মুফাসসিরে কুরআন কাদিরিয়া বারাকতিয়া, রিজভীয়ার প্রখ্যাত শায়েখ ছিলেন। যিনি তাঁর হায়াতে জিন্দেগীতে অসংখ্য অগণিত মুসলমান নর-নারীর শরিয়ত ও তরিকতের আজিম পেশওয়া ছিলেন। নিম্নে তাঁর মহান জিবনীর সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

জন্ম : খানদানে রিজভীয়ার এই উজ্জল নক্ষত্র আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ হামেদ রেযাখান বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি ১২৯২ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে মোতাবিক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন।

লক্বব সমূহ : তাঁর মূল নাম হচ্ছে মুহাম্মদ হামেদ রেযা আর উপাধি সমূহ হচ্ছে হুজ্জাতুল ইসলাম, জামালুল আউলিয়া এবং শায়খুল আনাম।

শিক্ষা গ্রহণ : হযরত আল্লামা হামেদ রেযা খান রহমতুল্লাহি আলাইহি সকল উলুম এবং ফুনুন স্বীয় বুর্জুগ পিতা চৌদ্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি যখন ছাত্রদের কে “দরস” প্রধান করতেন, তখন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলতেন আমার সম্মানিত পিতা এভাবে বলেছেন। এই কথা বলে তিনি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন। যা

স্বীয় পিতার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এছাড়া হুজ্জাতুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পিতা মুজাদ্দিদে আজম রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে ১৩২৩ হিঃ হজ্বের সময় যখন প্রথম বার হারামাইনে শরীফাইনে যান তখন তিনি মক্কা মোকাররামা এবং মদিনাতুল মোনাওয়ারায় হাজিরি দেন। তখন মক্কাশরীফে শায়খুল উলা হযরত আল্লামা মুহাম্মদ সাঈদ বিল বাছিল এবং মদিনায়ে তৈয়্যাবায় হযরত আল্লামা সায়েদ আহমদ বরযনজি এর দরসের মজলিশে শরীক হলে আকাবির উলামায়ে কেরাম তাকে সনদ প্রদান করেন। যেমন আল্লামা খলিল খুরবতী রহমতুল্লাহি আলাইহি ফিকহে হানাফীর সনদ প্রদান করেন। যিনি আল্লামা সায়েদ তাহতাভী এর মধ্যে মাত্র দুজনের ব্যবধান ছিল। এ ছাড়া হুজ্জাতুল ইসলাম কে সায়্যিদুনা আ'লা হযরত ফাজিলে বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি বিভিন্ন সনদ প্রদান করে তাকে দারুল উলুম মানজারুল ইসলাম বেরেলী শরীফ এর প্রথম সদরুল মুদাররিসিন এবং শায়খুল হাদীছ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। উল্লেখ্য হুজ্জাতুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে বায়যাবী শরীফ এর অতুলনীয় ব্যাখ্যাকার ছিলেন।

বাইআত ও খিলাফত : হুযুর হুজ্জাতুল ইসলাম সরকারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযাখান বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরিদ এবং খলিফা ছিলেন। এছাড়া তিনি হযরত শাহ আবুল হোসাইন আহমদ নুরী মারহারাবী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। তিনি সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয় বারাকতিয়া রিজভীয়ার চল্লিশতম ইমাম ও তরীকতের মহান শায়েখ ছিলেন।

হজ্ব ও যিয়ারত : হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রথম বার হজ্ব ও যিয়ারত আদায় করেছিলেন স্বীয় পিতা মুজাদ্দিদে আজম এর সাথে ১৩২৩ হিজরীতে। দ্বিতীয়বার হজ্ব ও যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন হয় ১৩২৪ হিজরীতে। তিনি ও তাঁর পিতা ফায়িলে বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহির মত সব সময় মদিনায়ে পাকে হাজিরি দেওয়ার জন্য বেকারার হয়ে থাকতেন।

মযহারে আ'লা হযরত : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযাখান রহমতুল্লাহি আলাই স্বীয় সন্তান কে বেশী ভালবাসতেন এবং তাকে নিয়ে গর্ব করতেন। আর কেনই বা তা করবেন না? কারণ এমন যোগ্য সন্তানের পিতা হওয়া কয়জন ব্যক্তির সৌভাগ্যে নসীব হয়। এই

জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী হামেদ রেখা খান নুরী বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পিতাকে সর্ব কাজে সর্ব সময় সহযোগিতা করতেন।

প্রিয় পাঠক! এখানে আরেকটি বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেখা খান রহমতুল্লাহি আলাইহির ছোট ছাহেব জাদা ছিলেন আল্লামা মুফতী মোস্তাফা রেখাখান বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর একমাত্র (শাহজাদা) সন্তান ছোট বেলায় ইন্তেকাল করেন বিধায় আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেখাখান রহমতুল্লাহি আলাইহির বংশ ধারা চালু রয়েছে হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী হামেদ রেখাখান নুরী বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহির আওলাদ এর মাধ্যমে।

যা-নশীনে আ'লা হযরত : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেখা মুহাদ্দিসে বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী হামিদ রেখাখান আলাইহি রাহমাকে তাঁর জীবদ্দশায় অলিয়ে আহাদ এবং বেরেলী শরীফের যা-নশীন হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। আ'লা হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর তাঁর জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য হুজ্জাতুল ইসলামকে অহ্বিত করে যান। আ'লা হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকালের এক জুমা পূর্বে তাঁর কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য আসা ব্যক্তিদের কে নিজে বাইআত না করে হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী হামেদ রেখাখান বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট বাইআত হওয়ার নির্দেশ ফরমান।

ইলমি এবং তাবলীগি কার্যক্রম : যা-নশীনে আ'লা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম হামেদ রেখাখান রহমতুল্লাহি আলাইহি একজন উঁচুমানের বক্তা, আরবী সাহিত্যিক, বিজ্ঞ আলোচক ছিলেন। তিনি দিন ইসলামের প্রচার প্রসার, ও আজমতে মস্তোফা সংরক্ষনে এবং স্বীয় কওমের কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন। স্বীয় ওয়ালিদে মুহতারাম সাইয়্যোদুনা আ'লা হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহির দর্শনে ইলমী খিদমত, মহলকে হক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রচার প্রসারে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ শহর, এলাকা সফর করেন। বিশেষ করে বেয়াদবে রাসূল ওয়াহাবী মতবাদীদের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার।

মুনাযারায় লাহোর : হক ও বাতিলের সংগ্রাম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। হক বাতিলের এই সংগ্রামে জয়

হয়েছে সত্যের পরাজয় হয়েছে মিথ্যার। এমনি একটি ঘটনা ঘটে ছিল ১৫ শাওয়াল ১৩৫২ হিজরীতে লাহোর। তাহলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং দেওবন্দীদের একটি মিটিং যা পরবর্তীতে মোনাযারা বা বাহাছে রূপান্তরিত হয়। দেওবন্দী ওয়াহাবীদের মূখ্য মোনাযির হিসাবে নির্বাচিত করা হয় তাদের মাওলানা আশরাফ আলী খানবী কে আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষে মূখ্য মোনাযির হিসেবে নির্বাচিত করা হয় হুজ্জাতুল ইসলাম, মজহারে আ'লা হযরত আল্লামা মুফতী হামেদ রেখাখান রহমতুল্লাহি আলাইহিকে। উভয় পক্ষের দায়িত্বশীলদের মনে এই আশা ছিল যে, উভয় পক্ষের আলোচনার দ্বারা সৃষ্ট বিরোধের মিমাসা হবে। সত্য প্রকাশ হবে। এবং সত্যকে উভয় পক্ষ মেনে নিবেন। এবং উভয়েই এক হয়ে যাবেন। নির্ধারিত সময়ে হুজ্জাতুল ইসলাম বেরেলী শরীফে থেকে পাকিস্তানের লাহোরে তাম্বীফ নিয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু আশরাফ আলী খানবী ছিলেন অনুপস্থিত। যার কারণে হুজ্জাতুল ইসলামের পক্ষে তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষে বাহসের রায় প্রদান করা হয়।

আল্লামা ইকবাল এর সাথে সাক্ষাত : মুনাযারার এই মোবারক সফরের এক পর্যায়ে হুজ্জাতুল ইসলাম এর সাথে সাক্ষাত হল বিশ্ব কবি, কবি সম্রাট ডক্টর আল্লামা ইকবাল এর সাথে। হুজ্জাতুল ইসলাম ডক্টর আল্লামা ইকবাল কে ওয়াহাবী দেওবন্দী আলিমদের রচিত কিতাব গুলো থেকে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শানে রেয়াদবী পূর্ন ইবারত গুলো দেখালেন তখন ডক্টর আল্লামা ইকবাল আশ্চর্য হয়ে বললেন এদের উপর আসমান ভেঙ্গে পড়া উচিত। এদের উপর আসমান ভেঙ্গে পড়ছে না কেন?

হুজ্জাতুল ইসলামের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা : হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী হামেদ রেখাখান বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি তখনকার রাজনীতি বিদগণের কুটচাল সম্পর্কে সম্মুখ অবগত ছিলেন। বিধায় তিনি মুসলমানদেরকে ঐ সকল স্বার্থবাজ মুসলিম রাজনীতি বিদগণের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিনত হতে দেননি। তিনি তৎসময়ের মুসলিম আলিম ও নেতৃবৃন্দকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার যথাযথ দিক নির্দেশ করেছেন।

মাওলানা আব্দুল বারী ফিরীজি মহল্লীর তাওবা : মাওলানা আব্দুল বারী ফিরীজি মহল্লী এর কিছু

রাজনৈতিক আচরণ এবং লেখার প্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ রেযাখাঁন আলাইহির রাহমা তার বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করেন। একদা মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিস্তী মহল্লী নজদীগন কর্তক হারামাইনে শরীফাইন এর মাযার সমূহের অবমাননা ও ধ্বংসের প্রেক্ষিতে একটি কনফারেন্স এর আয়োজন করেন। হুজ্জাতুল ইসলাম জাম'আতে রেযায়ে মস্তোফা এর পক্ষ থেকে মশহুর কয়েকজন আলিমকে সাথে নিয়ে লক্ষ্মৌতে পৌছেন। সেখানে মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিস্তী এবং তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মুরিদিন বৃন্দ সহ, হুজ্জাতুল ইসলামকে প্রানঢালা সংবর্ধনা জানান। মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিস্তী হুজ্জাতুল ইসলামের সাথে মোসাফাহ অর্থাৎ হাত মিলাতে চাইলে হুজ্জাতুল ইসলাম তার হাত গুটিয়ে নেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাকে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার সম্মানিত পিতার মতের সমর্থন করবেন না এবং আপনার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে তাওবা করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার সাথে হাত মিলাব না মাওলানা আব্দুল বারী যেহেতু সত্যের সন্ধানী আলেম ছিলেন এবং তার লবক ছিল “ ছাওতুল ঈমান” সেহেতু তিনি সত্যকে সত্য মনে করে নিঃসংকোচে স্বীয় মত থেকে তাওবা করেন এবং উদার মনে ঘোষণা দেন আমার অবস্থা যা-ই হোকনা কেন আমি আল্লাহর ভয়ে তাওবা করছি কেননা আমাকে মহান আল্লাহর মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে। মাওলানা আহমদ রেযাখান আলাইহির রাহমা যা লিখেছেন অর্থাৎ যে ফতোয়া প্রণয়ন করেছেন তা সত্য ও সঠিক।

ইসলামী আইন সংরক্ষনে তাঁর ভূমিকা : লক্ষ্মৌতে মুসলমান গনের নিকাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণের জন্য আয়োজিত একটি কনফারেন্সে যোগদানের জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা হামেদ রেযা খান বেরেলী রহমতুল্লাহি আলাইহি সদরুল আফাজিল বদরুল মামাছিল হযরত আল্লামা মুফতী সৈয়দ নাস্ট্র উদ্দিন মুরাদাবাদী শাইখুল মশায়েখ আল্লামা মুফতী মাওলানা তাকাদুস আলী খান রাহিমাহুমুল্লাহ সহ বেরেলী শরীফ থেকে সেখানে গমন করেন। উক্ত কনফারেন্সে শিয়া ও নদভী মৌলভীগন ব্যতীত শাহ সোলাইমান, চীপজাষ্টিস হাইকেটি ও হযরত মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিস্তী রহমতুল্লাহি আলাইহির ভাতিঝা ও জামাতা আব্দুল ওয়ালী ও ছিল। উক্ত কনফারেন্সে হুজ্জাতুল ইসলামের সারগর্ভ বক্তব্যের আলোকে নিকাহ ও তালাক সম্পর্কিত বিষয়ে চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইসলামী শরীয়াআর সু-রক্ষায় এবং রাসূলে কারিম রাউফুর রাহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এর শান মান সুমন্ত রাখার ব্যাপারে হুজ্জাতুল ইসলাম সবসময় নির্ভীক ভূমিকা পালন করেন।

জাতীর সেবা : ১৯৩৫ সালে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ণে চারদিন ব্যাপী এক কনফারেন্স এর আয়োজন করেন যার সভাপতি ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম নিজে। উক্ত কনফারেন্সে হুজ্জাতুল ইসলাম সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করে জাতীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার কথা ঘোষণা করেন।

মুরিদান ও খোলাফায়ে কেরাম : কাদিরিয়া রিজভীয়ার আজিম পেশওয়া হুজ্জাতুল ইসলাম এর মুরিদানের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। বর্তমানে ও তাঁর অসংখ্য মুরিদান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মওজুদ রয়েছেন। এ ছাড়া হুজ্জাতুল ইসলাম তাঁর জীবদ্দশায় সিলসিলায়ে আলিয়া কাদিরিয়া রিজভীয়ার প্রচার প্রসারে অনেককে খিলাফত প্রদান করেন। তার খলিফাগন হচ্ছেন মুহাদ্দিস আল্লামা সরদার আহমদ লায়লপুরী, মাওলানা শাহ হাবিবুর রহমান, মাওলানা শাহ হাশমত আলী, মাওলানা শাহ ইব্রাহিম রেযাখান, (জিলানী মিয়া) মাওলানা মুফতী তাকাদুস আলী খান, রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। উল্লেখ যে আল্লামা মুফতী তাকাদুস আলী খান আলাইহির রাহমার মুরিদ এবং খলিফা হলেন বর্তমান সময়ের মসলকে আ'লা হযরত এর সফল প্রচারক এদারায় তাহকিকাতে ইমাম আহমদ রেযা করাচী পাকিস্তানের সভাপতি, ছাহেবজাদা আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ ওয়াজাহাত রাসূল কাদেরী মান্দাজিল্লুহ আলী। তিনি আমি (গুনাহগার) লিখক কে খেলাফত দ্বারা মসলকে আলা হযরত এবং সিলসিলায়ে কাদিরিয়া বারাকাতিয়া রিজভীয়া আলিয়ার প্রচার ও প্রসারে ইজাযত প্রদান করেন।

হুজ্জাতুল ইসলামের রচনা বলী : হুজ্জাতুল ইসলাম ছিলেন স্বীয় পিতার যোগ্য উত্তর সূরী। তাই তিনি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক। তাঁর প্রনীত কিতাব গুলোতে তাঁর ইলমী যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমান পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা বলীর নাম উল্লেখ করা হল।

১. আস-সারেমুর রাব্বানী আলা আছরফিল কাদিয়ানী।
২. আদ-দৌলাতুল মক্কিয়ার উদ্দু তরজমা।

৩. হুস সামুল হারা মাইন এর উর্দু তরজমা।

৪. হাশিয়ায়ে মুল্লাহ জালাল।

৫. মুকাদ্দামা আল-ইয়া-যাতুল মতীনাহ লি ওয়ালামায়ে বাক্বাতা ওয়াল মাদীনাহ।

৬. নাতীয় দেওয়ান।

৭. মজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে হামিদিয়া।

হুজ্জাতুল ইসলামের আওলাদ : হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম এর দুই ছাহেবজাদা এবং চার জন ছাহেব জাদী ছিলেন। ছাহেবজাদাগন হলেন ১. মুফাসসিরে আযমে হিন্দ মাওলানা ইবরাহীম রেযাখান বেরলভী (জিলানী মিয়া) এবং হযরত মাওলানা হাম্মাদ রেযাখান বেরেলী (নোমানী মিয়া) রাহিমাহুমুল্লাহ।

ইন্তেকাল : হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী হামিদ রেযাখান বেরেলী রহমতুল্লাহি আলাইহি ১৩৬২ হিজরীর ১৭ জমাদিউল আওয়াল ২৩ মে ১৯৪৩ ইসায়ীতে নামাজে এশা পড়া অবস্থায় তাশাহুদ পাঠ কালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বিশিষ্ট খলিফা ও শাগরিদ আল্লামা মুহাদ্দিস সরদার আহমদ লায়লপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জানাযার নামাজের ইমামতি করেন।

দাফন : হুজুর হুজ্জাতুল ইসলামকে তাঁর সম্মানিত পিতা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রেযাখান রহমতুল্লাহি আলাইহির মাযারের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।

উরস শরীফ : প্রতি বছর ১৭ জুমাদিউল আউওয়াল হুজ্জাতুল ইসলামের সালানা উরস শরীফ উরসে হামিদী নামে মহা সমারোহ বেরেলী শরীফে উদযাপিত হয়। এবং উক্ত উরসে হামিদীতেই জামেয়া রেজতীয়া মনজারুল ইসলামের সমাপনী ছাত্রদের কে দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হয়।

কারামাত : হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম অধিক কারামতের অধিকারী ছিলেন। এখানে বরকত হাসিলের জন্য একটি কারামতের ঘটনা উল্লেখ করে লেখার সমাপ্তি টানছি। ভারতের বেনারসে হুজ্জাতুল ইসলামের তাবলীগী সফর বেশী হত। কোন এক সফরে এক হিন্দু ভদ্র লোক তার ধর্মের ঠাকুর সন্যাসীদের কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে হুজ্জাতুল ইসলামের যশ খ্যাতি শুনে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নিজের সমস্যার কথা ব্যক্ত করে বলেন আমি নিঃসন্তান। আমি সন্তান চাই। হুজ্জাতুল ইসলাম এই

সুযোগ তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার দাওয়াত পেশ করলেন। ঐ হিন্দু ভদ্র লোক শর্ত দিয়ে বলল আমার যদি ছেলে সন্তান হয় তাহলে আমি মুসলমান হয়ে যাব। হুজ্জাতুল ইসলাম বললেন একটি নব্বু তৈয়ার দুটি ছেলে সন্তান হবে। হিন্দু লোকটি চলে গেল। এক বছর পর ঠিকই মহান আল্লাহ তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। উক্ত হিন্দু লোক পুত্র সন্তান লাভ করে হুজ্জাতুল ইসলামের হাতে হাত রেখে কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। এক বছর পর ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় পুত্র সন্তান লাভ করেন।

আ'লা হযরতের উক্তি : হুজ্জাতুল ইসলামকে আ'লা হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহি খুব বেশী ভাল বাসতেন। তাই তাকে আদর করে বলতেন হামিদুম মিনি ওয়া আনা মিন হা-মিদ অর্থাৎ হামিদ আমার আমি হামদের।

মহান আল্লাহ আমাদের কে যেন হুজ্জাতুল ইসলামের ফয়েয ও বারাকাত দান করেন আমিন।

আপনি কি মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে ভাবছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।

কাজী অফিস

আলহাজ্জ কাজী মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক উল্লাহ ভূঞা মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রার

যোগাযোগ
১৪নং কোর্ট হাউজ স্ট্রীট, আসমা মঞ্জিল (২য় তলা)
(উকিল লাইব্রেরীর উত্তর পার্শ্বে)
কোর্ট কাচারী, কোতওয়ালী ঢাকা।

মোবাইল : ০১৭১১-০৩৫৯০৫,
০১৫৫২-৪৬৪৭৫৯, ০১৭১৪-৯৯৫৭২৩

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

মূল: হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার
খান নঈমী (রা.)

অনুবাদ: অধ্যাপক লুৎফর রহমান

মকছুদ অনুযায়ী সফরের হুকুম বর্তায়। অর্থাৎ হারাম কাজের জন্য সফর করা হারাম, জায়েজ কাজের জন্য জায়েজ, সুন্নাত কাজের জন্য সুন্নাত এবং ফরজ কাজের জন্য ফরজ। যেমন- ফরজ হজ্বের জন্য সফর করাও ফরজ। মাঝে মাঝে জিহাদ ও বাণিজ্যের জন্য সফর করা সুন্নাত। কেননা এ কাজ সুন্নাত। হুজুর আলাইহিস সালামের রওজা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ওয়াজিব, কেননা এ জিয়ারত ওয়াজিব। বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, আত্মীয় সজনের বিবাহ শাদী, খতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যোগদান এবং চিকিৎসার জন্য সফর করা জায়েজ, কেননা এ গুলো হলো জায়েজ কাজ। চুরি ডাকাতির জন্য সফর করা হারাম, কেননা এ কাজগুলো হারাম।

মোট কথা হলো, সফরের হুকুমটা জানতে হলে, প্রথমে এর মকছুদটা জেনে নিতে হবে। মূলতঃ কবর যিয়ারতের নামই হচ্ছে উরস। সুতরাং কবর যিয়ারত যেহেতু সুন্নাত, সেহেতু এর জন্য সফর করাটাও সুন্নাত বলে বিবেচ্য হবে। কুরআন করীমে অনেক ধরণের সফর প্রমাণিত আছে-

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুল (স.)-এর উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে মুজাহির হয়ে বের হলো এবং (পথে) তার মৃত্যু ঘটলো, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে গলে। এতে হিজরত উপলক্ষে সফর প্রমাণিত হলো।

‘স্মরণ করুন, যখন মুছা (আঃ) নিজের খাদেমকে বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবে না, যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছবো, যেখান দু’টি সমুদ্র মিলিত হয়েছে। হযরত মুছা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তথায় গিয়েছিলেন। এতে মাশায়েখের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সফর প্রমাণিত হলো।

‘হে আমার পুত্রগণ, ইউছুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইওনা। হযরত এয়াকুব (আঃ) তাঁর অন্যান্য সন্দানদেরকে হযরত

ইউছুফ (আঃ)-এর সন্ধানের নির্দেশ নিয়ে ছিলেন। অতএব প্রিয়জনের সন্ধানে সফর করা প্রমাণিত হলো। হযরত ইউছুফ (আঃ) বলেছেন, আমার এ কোর্তাটা নিয়ে যাও, আমার আঁকার মুখের উপর রাখিও, তাঁর চোখ খুলে যাবে। এতে চিকিৎসার জন্য সফর প্রমাণিত হলো।

অতঃপর যখন তারা সবাই হযরত ইউছুফ (আঃ)-এর কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি স্বীয় মা-বাপকে নিজের পার্শ্বে বসতে দিলেন। এতে ছেলে মেয়েদের সাথে দেখা করার জন্য সফর প্রমাণিত হলো। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলেরা বাপের কাছে আরয করলেন-

আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে দিন। আমরা খাদ্যশস্য নিয়ে আসবো এবং তাকে নিশ্চয়ই হেফাজত করবো। উপার্জনের জন্য সফর প্রমাণিত হলো। হযরত মুছা (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হলো, ফেরাউনের কাছে যাও। কারণ সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তবলীগের জন্য সফর প্রমাণিত হলো।

মিশকাত শরীফের কিতাবুল ইলমে বর্ণিত আছে (যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হলো, সে আল্লাহর পথে রয়েছে) আর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে (জ্ঞান অর্জন কর, যদি চীনেও যেতে হয়)। প্রসিদ্ধ ফার্সী পুস্তিকা করীমাতে আছে (জ্ঞান অনুসন্ধান করা তোমার জন্য ফরজ। এর জন্য সফরেরও প্রয়োজন আছে। জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য সফর প্রমাণিত হলো। প্রখ্যাত ফার্সী কাব্যগ্রন্থ গুলিস্তায় উল্লেখিত আছে-

অর্থাৎ মৃত্যুর আগে পৃথিবীটা একবার পরিভ্রমণ করে দেখ। ভ্রমণের জন্য সফর প্রমাণিত হলো।

কুরআন করীমে বর্ণিত আছে-

অর্থাৎ তাঁদেরকে বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং কাফিরদের কি পরিণাম হয়েছে, তা দেখ। যেসব দেশে খোদায়ী গজব নাযিল হয়েছে, ওগুলো দেখে সতর্ক হওয়ার সফর প্রমাণিত হলো।

যখন এ রকম সফর প্রমাণিত হলো, তাহলে আউলীয়া কিরামের মাযার যিয়ারত উপলক্ষে সফর এমনিই প্রমাণিত বলে ধরে নেয়া যায়। আউলিয়া কিরাম হলেন, রুহানী ডাক্তার এবং ওনাদের কয়েজও ভিনু ভিনু। ওনাদের মাযারে গেলে খোদার শান চোখের সামনে ভেসে উঠে। খোদাপ্রাপ্তিগণ মৃত্যুর পরও দুনিয়াতে বিরাজ করেন, এর দ্বারা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর ওনাদের মাযারসমূহে দো‘আ সহস্রাং কবুল

হয়। ফাতওয়ায়ে শামী প্রথম খণ্ড যিয়ারতে কুবুর শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

অর্থাৎ কবর যিয়ারত উপলক্ষে সফর করা মুস্তাহাব। যেমন আজকার হযরত খলিলুর রহমান ও হযরত হৈয়দ বদবী (রহঃ)-এর মাযার যিয়ারতের জন্য সফর করা হয়। আমি এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামদের কারো ব্যাখ্যা দেখিনি। তবে শাফেঈ মাযহাবের কয়েকজন আলেম তিন মসজিদ ভিন্ন সফর নিষেধ-এ হাদীছের উপরে অনুমান করে নিষেধ বলেছেন। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এ নিষেধাজ্ঞাকে খণ্ডন করেছেন এবং পার্থক্যটা বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। একই বিষয়ে শামীতে আরও উল্লেখিত আছে-

কিন্তু আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভে ও যিয়ারতকারীদের ফায়দা পৌছানোর বেলায় নিজেদের প্রসিদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তি অনুসারে ভিন্নতর।

ফতওয়ায়ে শামীর ভূমিকায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর ফজীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম শাফেই (রহঃ)-এর উক্তিও একই রকম।

আমি ইমাম আবু হানিফা থেকে বরকত হাসিল করি এবং তাঁর মাযারে আসি। আমার কোন সমস্যা দেখা দিলে, প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়ি। অতঃপর তাঁর মাযারে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তখন সহসা আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেলঃ কবর যিয়ারতের জন্য সফর, কেননা ইমাম সাফেঈ (রা.) নিজের জন্মভূমি ফিরিস্তিন থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযারে যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সুদূর বাগদাদ শরীফে আসতেন, কবরবাসীদের থেকে বরকত গ্রহণ, ওনাদের মাযারের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং কবরবাসীদের অভাব পূর্ণ করার মাধ্যমে মনে করা। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারতের জন্য সফর করা আবশ্যিক। ফতওয়ায়ে রশিদীয়ায় প্রথম খণ্ড এর ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- বুজুর্গানে কিরামের যিয়ারতের জন্য সফরের কারণ প্রসঙ্গে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ জায়েয বলেন এবং কেউ কেই নাজায়ে বলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের আলেমগণ হচ্ছে আহলে সুন্নাতের অনুসারী। বিতর্কিত মাছআলা নিয়ে বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। আর আমাদের মত ইমামের অনুসারীদের পক্ষ থেকে সমাধান দেওয়াও অসম্ভব- রশীদ আহম্মদ।

এখন আর উরস উপলক্ষে সফর করতে কাউকে নিষেধ করার কোন অধিকার দেওবন্দীদের নেই। কেননা মৌলভী রশীদ বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং এর কোন সিদ্ধান্তও দেননি। বিবেকও বলে যে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর জায়েয হওয়া চাই। কেননা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে সফর হালাল বা হারাম হওয়াটা এর মকছুদ থেকেই বোঝা যায়। এ সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবর যিয়ারত যা নিষেধ নয়, কেননা যিয়ারতে কবল সাধারণভাবেই অনুমোদিত তাহলে সফর কেন হারাম হবে? অধিকন্তু দ্বীন ও দুনিয়াবী কাজ-কারবারের জন্য সফর করা হয়। এটা একটি দ্বীন কাজের জন্য সফর হেতু হারাম কেন হবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

উরস উপলক্ষে সফর প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও এর জবাব

১নং আপত্তি: মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে।

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন দিকে সফর করা যাবে না। এ তিন মসজিদগুলো হলো- বায়তুল্লাহ, বাইতুল মোকাদ্দাস ও আমার এ মসজিদ। এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে, এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সফর করা যায়েয নাই এবং কবর যিয়ারতের সফরও এ তিনটির বাইরে বিধায় নাজায়েয।

উত্তর: এ হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে এ তিন মসজিদে নামাযের ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়। যেমন মসজিদে বায়তুল্লাহ এক নেকীর ছওয়াব অন্যান্য জায়গার এক লাখের সমান এবং বায়তুল মোকাদ্দেস ও মদীনা পাকের মসজিদে এক নেকীর ছওয়াব পঞ্চাশ হাজারের সমান। সুতরাং এসব মসজিদসমূহে এ নিয়তে দূর থেকে সফর করে আসা কল্যাণকর ও জায়েয। কিন্তু অন্য কোন মসজিদের দিকে একই নিয়তে সফর করা অনর্থক ও নাজায়েয। কারণ উপরোক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত বাকী সব মসজিদের ছওয়াব একই বরাবর। দিল্লীর জামে মসজিদে জুময়াতুল বিদা (রমজানের শেষ জুমা) পড়ার জন্য অনেক লোক দূর দুরান্ত থেকে সফর করে আসে এবং মনে করে যে ওখানে ছওয়াব বেশী হয়। আসলে এটা নাজায়েয, কারণ উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা এবং বেশী ছওয়াবের প্রশ্রািত করা নিষেধ প্রমাণিত হয়েছে। যদি হাদীছের বিশ্লেষণ এরকম করা না হয়, তাহলে আমি প্রথম অধ্যায়ে যে সব সফর কুরআন থেকে প্রমাণ করেছি, সবই হারাম গণ্য হবে এবং আজকাল ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, ধর্মীয়

উর্জনি অর্জনের জন্য ও দুনিয়াবী অনেক কাজের জন্য যত রকিম সফর করা হয়, সবই হারাম বিবেচিত হবে। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ “আশআতুল লমআতে” এ হাদীছের ব্যাখ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন-

অর্থাৎ কতক আলেম বলেন যে, এখানে মসজিদের বেলায় কথা হয়েছে, অর্থাৎ ওই তিন মসজিদ ভিন্ন অন্যান্য জায়গা এ বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। মিশকাত শরীফের অপর ব্যাখ্য গ্রন্থ মেরকাত হাদীছ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

ইমাম নব্বীর (রহ.) শরহে মুসলিম বর্ণিত আছে- ইমাম আবু মোহাম্মদ বলেছেন যে, ওই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সফর করা হারাম। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। ইহায়ায়ে উলুমে উল্লেখিত আছে- “কতক আলেম বরকতময় স্থানসমূহ ও ওলামায়ে কিরামের মাযারে যিয়ারত উপলক্ষে সফর করাকে নিষেধ বলে। কিন্তু আমি যা বিশ্লেষণ করে পেয়েছি, তা এরকম নয় বরং কবর যিয়ারতের নির্দেশ আছে। যেমন হাদীছে যে বাকী সব মসজিদ ফজিলতের দিক দিয়ে একই বরাবর। কিন্তু বরকত ভিন্ন ভিন্ন। এসব নিষেধকারী কি নবীদের মাযার- যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত মুহা (আ.), হযরত ইয়াহিয়া (আ.) প্রমুখের মাযার যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করতে পারবে কি? নিশ্চয়ই না, কারণ এটা অসম্ভব। আর আল্লাহর ওলীগণের বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য। সুতরাং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য যদি ওনাদের সেখানে সফর করে যাওয়া হয়, যেমনি ওলামায়ে কিরামের জিন্দেগীতে তাঁদের কাছে যাওয়া যায়, কি অসুবিধা আছে? মিশকাত শরীফের কিতাবুল জিহাদে জিহাদের ফজীলত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

হাজী, গাজী ও ওমরাকারী ব্যতীত অন্য কেউ সমুদ্র পথে সফর করোনা। কারণ সমুদ্রের নীচে আগুন বা আগুনো নীচে সমুদ্র আছে। তাহলে কি এ তিন ধরণের লোক ব্যতীত অন্যদের জন্য কি সমুদ্র পথে সফর হারাম? মোট কথা হলো হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে তা-ই, যা আমি বর্ণনা করেছি। অন্যথায় পার্থিব জীবন যাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

২নং আপত্তি: আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তার রহমতও সব জায়গায় রয়েছে। দাতা হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সর্বত্র মওজুদ। তা সত্ত্বেও কোন জিনিষটা তালাশ করার জন্য আউলীয়া কিরামের মাযারে সফর করে যাওয়া হয়?

উত্তর: আউলীয়ায়ে কিরাম হচ্ছেন আল্লাহর রহমতের দরজাসমূহ। এ দরজাসমূহ দিয়েই রহমত প্রবাহিত

হয়। রেলগাড়ী এর সারা লাইন দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু একে ধরতে হলে স্টেশনে যেতে হয়। যদি অন্যত্র লাইনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকেন, রেল নিশ্চয়ই আপনাদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে সত্য, কিন্তু আপনি তা ধরতে পারবেন না। আজকাল দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে, চাকুরী ব্যবসা ও অন্যান্য উপলক্ষে সফর কেন করেন? আল্লাহতো রিজিকদাতা এবং তিনি সব জায়গায় রিজিক দেন। ডাক্তারের কাছে রোগী কেন সফর করে আসে? আল্লাহই তো আরোগ্যদানকারী এবং তিনিতো সর্বত্র আছেন। আবহাওয়া পরিবর্তন করার জন্য দার্জিলিং ও কাশ্মীর ভ্রমণ করা হয় কেন জানেন? ওখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। আর আউলিয়া কিরামের স্থানসমূহের আবহাওয়া ঈমানের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ, তা'লা হযরত মুহা আলাইহিস সালামকে হযরত খিজির (র.)-এর কাছে কেন পাঠিয়েছিলেন? ওগুলো সব কিছুতো ওখান থেকেই দিতে পারতেন। কুরআন করীমে আছে (তথায় হযরত জাকারীয়া (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। বোঝা গেল যে, হযরত জাকারীয়া আলাইহিস সালাম হযরত মরিয়মের কাছে দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন অর্থাৎ ওলীর কাছে গিয়ে দোয়া করা মানে দোয়া কবুল হওয়া। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আওলীয়ায়ে কিরামের মাযার সমূহের কাছে দোয়া বেশী কবুল হয়।

৩নং আপত্তি: যেই গাছের নীচে বায়তুর রিজওয়ান (আনুগত্যের শপথ) হয়েছিল, লোকেরা ওই জায়গাটাকে যিয়ারতগাহ পরিণত করে ছিল। হযরত ওমর (রা.)-এ জন্যে ওই গাছটিকে কাটিয়ে ফেলালেন। তাই আউলিয়া কিরামের কবর সমূহকে যিয়ারতগাহে পরিণত করাটা হযরত ওমর (রা.)-এর আমলের বিপরীত।

উত্তর: এটা নিছক ভুল ধারণা। হযরত ওমর (রা.) ওই গাছটিকে কখনও কাটেননি। বরং সেই মূল বৃক্ষটা অলৌকিকভাবে মানুষেদুষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লোকেরা ধোকা পড়ে অন্য আর একটি বৃক্ষের যিয়ারত শুরু করে দিয়েছিল। এ ধোকা থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি সেই গাছটিকে কাটিয়ে ফেলেন। হযরত ফারুককে আযম (র.) যদি পবিত্র বস্তু যিয়ারতবিরোধী হতেন, তাহলে হযুর আলইহিস সালামের চুল মোবারক, তোহবন্দ শরীফ, রাওজা পাক সবতো তাঁর সামনে যিয়ারতগাহে পরিণত হয়েছিল, এগুলোকে কেন রেহাই দিলেন?

আজানের পূর্বে ও পরে দুরুদ ছালাম নতুন আবিষ্কার নয়

পীরজাদা মোহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ বাগদাদী

সচেতন শিক্ষিত জনগণ, “আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহ ওয়ামাগফিরাহ”

১. “আল্লাহর বাণী ইন্নালাহা ওয়ামালায়িকাতাহ ইয়োহান্নুনা আলানানাবী ইয়া আইয়ুহান্নাজিনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লেমু তাছলিমা” অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতাকুল নবী (স.) এর উপর দুরুদ পড়তে রয়েছে। অতঃএব হে ঈমানদারগণ তোমরাও তা করতে থাক। এখানে কোন সময়-স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়নি অবশ্য আল্লামা শামীর মতে হাদীসের আলোকে দুরুদ শরীফ পাঠ নিষিদ্ধ হবার সাতটি স্থান রয়েছে। যেমন- (১) স্ত্রী সহবাস কালে (২) পায়খানা প্রস্রাবের সময় (৩) ব্যবসার মাল চালু হবার জন্য (৪) হোঁচট খাওয়ার পর (৫) আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণের পর (৬) পশু জবাহ করার সময় (৭) হাঁচি দেওয়ার পর (সূত্র:) শামী ১ম খণ্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠা) উপরোক্ত সাত স্থান ব্যতীত সর্বাবস্থায় দুরুদ পাঠ করা বৈধ ও অধিক বরকতময় আমল। হযরত আহম্মদ শিহাবুদ্দিন হেফাযীর মতে সময় নির্ধারণ ছাড়া অধিক হারে দুরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজীব। যা উক্ত আয়াতের “ছাল্লু” শব্দ হতে প্রমাণিত। (নাছিমুর রিয়াজ শরহে শিফা ৩য় খণ্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠা) মোল্লা আলী ক্বারী মতে ও আল্লাহ তায়ালা দুরুদ শরীফ পাঠে নির্দেশ প্রদানে কোন সময় নির্ধারণ করে দেন নাই। তাই সব সময় উপরোল্লিখিত (সাত স্থান ব্যতীত) দুরুদ শরীফ পাঠ করা যাবে। (নাছিমুর রিয়াজ ৩য় খণ্ড ৪৪৭ ও ৪৪৮ পৃষ্ঠা) মোল্লা আলী ক্বারীর মতে ও আল্লাহ তায়ালা দুরুদ শরীফ পাঠে নির্দেশ প্রদানে কোন সময় নির্ধারণ করে দেন নাই। তাই সব সময় উপরোল্লিখিত (সাত স্থান ব্যতীত) দুরুদ শরীফ পাঠ করা যাবে। (নাছিমুর রিয়াজ ৩য় খণ্ড ৪৪৭ ও ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

২. আবু দাউদ শরীফ, বাবুল আজান ফাউক্বাল মিনার ১ম খণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য মদীনা শরীফের এক মহিলা ছাহাবীর ঘর মদীনা শরীফের মসজিদে নববী আশে পাশে ঘর সমূহ হতে উঁচু ছিল। হযরত বিল্লাল (রাঃ)

শেষ রাত্রিতে এসে ঐ ঘরের ছাদে উঠে অবস্থান করে। ফরজ হবার অপেক্ষায় থাকতেন, আর ফজর এর আজানের সময় হলে এই দোয়াটি পাঠ করতেন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আহমাদুকা ওয়াছতায়িনুকা আলা ক্বোরাইশ আন ইউকি’মু দ্বীনাকা” এবং পর পরই আযান দিতেন। এই দোয়াটি তিনি কখনো ভুলে যেতেন না, বরাবরই ফজরের আযানের পূর্বে পড়তেন। বুঝা গেল আযানের পূর্বে কোন দোয়া পাঠ করা জায়েজ। তা না হলে দোয়া সমূহ হতে দুরুদ শরীফই হল উত্তম দোয়া ও জিকির। তাই আযানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ কা হযরত বিল্লাল (রা.) এর উপরোক্ত দোয়া পাঠ হতে বৈধ হওয়াটা প্রমাণিত।

৩. বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ “তাফসীরে রুহুল মায়ানী” ১১তম খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠা ও “তাফসীরে রুহুল বায়ান” ৭ম খণ্ড ২২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যেক দোয়ার পূর্বে ও পরে দুরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজীব। আভিধানিক অর্থে আযান যেহেতু দোয়া, আহবান ইত্যাদি সেহেতু আযানের পূর্বে ও পরে দুরুদ শরীফ পাঠে কোন আপত্তি থাকতে পারেনা, বরং তা সুন্নত বা মুস্তাহাব হিসাবে গন্য হয়।

৪. প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ আল্লামা আলাউদ্দিন হাফসফীর মতে, সাধারণ সময়ে (সাত স্থান ব্যতীত) দুরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। (দুররুল মুখতার ১ম খণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠা)

৫. আল্লামা কাজী আয়াতের মতে পবিত্র কোরআনে যেহেতু দুরুদ শরীফ পাঠের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়নি বিধায় নিয়মিত দুরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিবের পর্যায়ে। (সূত্র শেফাশরীফ ২য় খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা)

৬. আল্লামা শায়খ যাইন বিন শায়খ আবদুল মজিদ আশ শাফেঈ প্রণীত (ফাতহুল মায়ানী) হাশিয়া এয়ানাভূত তালেবীন কিতাবের ২২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। ইকামতের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। যা বর্তমানে ইরাক, আশ্মান, মিশর, সিরিয়া, সুদান, থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তান সহ আরো অন্যান্য আরব মুসলিম দেশ সমূহে প্রচলন রয়েছে। যা আমি লেখক ইরাকস্থ সাদ্দাম ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় অধ্যায়নরত অবস্থায় অবলোকন করেছি।

৭. আল্লামা শামী (রা.) এর মতে আযানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করার প্রথা চালু হয় ৭৮১ হিজরীতে [সূত্র: হোছনুল মুহাযারা কৃত আল্লামা সুয়ুতী (রা.)

৮. ৭৮১ হিজরী হতে ১১৫০ হিজরী পর্যন্ত আযানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠের প্রথা চালু ছিল। আল্লামা

জালালুদ্দিন সুযুতী প্রণীত হোছানুল মুহাযারা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ফাতহুল মায়ানী কিতাবে শায়খ যাইন উল্লৈ লখ করে ৭৮১ হিজরী সনে সুলতান ছালাউদ্দীন আইউবির নির্দেশে আযানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠের নিয়ম চালু হয়েছিল।

৯. আল্লামা ছাখাবী প্রণীত “আলকাউলুল বাদিঈ” কিতাবে ৭৯১ হিজরীতে চালু হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মতে সুলতান নাসের ছালাউদ্দীনের শাসনামলে তারই নির্দেশে আযানের পর দুরুদ শরীফে পাঠের প্রথা চালু হয়েছিল।

১০. আল মোতাদিল মোনতাকিদ কৃত ফজলে রাসুল বাদাউয়ুনী (র.) কিতাবে রয়েছে কোন একটা মুস্তাহাব কাজের উপর একমত সাব্যস্ত হবার পর তা হারাম বরা কুফুরী। তাই আযানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করার বিরোধীতা করে বিদআত বলা গীতা পাঠের সাথে তুলনা করা হিন্দুদের উলু দেয়ার সাথে তুলনা করা দুরুদ শরীফের প্রতি চরম অবমাননা এবং সাথে সাথে হরকারে দু’আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবী করার নামান্তর। এ ব্যাপারে ফতোয়া কাজী খাঁন কিতাবে, ফাতোয়া শামী আল মোতাকিদুল মোস্তাকিদ ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে বলবো, আযানে পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব তথা অতি উত্তম কাজ। যে সমস্ত স্থান বা মসজিদে এ প্রথা চালু আছে তাদেরকে মোবারকবাদ এবং যে সমস্ত মসজিদে এখনো চালু হয়নি তাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা এ প্রথা চালু করে নবী প্রেমের প্রতি মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করবেন। তবে এ ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এটা করলে ছাওয়াব পাবেন। তাই আসুন আর বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা নয়।

সুন্নী মুসলিম ভাইগণ!

সচেতন আপামর সুন্নী জনতা উপরোক্ত অসংখ্য দলীল, প্রমাণ, নির্ভের যোগ্য কিতাবের বরাত পাওয়ার পরে ও যদি ছিদ্রান্বেষনকারী আযানের পূর্বে ও পরে পবিত্র ছালাতু সালামকে নাজায়েজ, বেদআত, শরিয়ত সম্মত নয় গোমরাহী বলে সরলমনা সুন্নী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তি করে ঈমান ও আক্বীদাকে নষ্ট করে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম থেকে দূরে সরাতে চায় এমন লোকদের প্রতি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে প্রকাশ্যে সরকারী নিরাপত্তা ও অনুমোদন ক্রমে বাহাছ করার জন্য যে কোন হক্কানী সুন্নী আলেমগণের নিকট হইতে গ্রহণ করার জন্য দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি।

কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা

যে কোন ধরনের জটিল রোগ, মনোব্যাঞ্জা
পূরণের তদবীর ও সুচিকিৎসা করা হয়।

ঃ যোগাযোগ ঃ

আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবুল কালাম

১১৫ উত্তর বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৯১৭-৭৪৮৮৯২

ঃ সাক্ষাতের সময় সূচী ঃ

প্রতিদিন : সকাল : ৭:৩০ থেকে দুপুর : ১১:৩০ মিনিট

বিকাল : ৫:০০ থেকে রাত : ১০ টা শুক্রবার বন্ধ

দুরান্তা
DURANTA

HOUSE OF QUALITY

16, (110/4) Atish Dipankar
Road, Bashaboo, Dhaka
Phone : 7217970

TAILORING

House # 36, Road # 5, Block # C, Banasree
Rampura, Dhaka, Phone: 7286767

কানযুল ঈমান-২২

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallim)

মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব

ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ

অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢা.বি।

মানবতাবোধ

সাম্যের কথাই বলি আর ভ্রাতৃত্বের কথাই বলি এর কোনটাই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবেনা, যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হবে। মানবতাবোধ ছাড়া সমাজে শান্তির আশা করা যায় না। মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ। মানবতাবোধ হল মানুষের জন্যে অনুভূতি, মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং মানুষের সুখ-শান্তিতে আনন্দিত হওয়া। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে; মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়, মানব কল্যাণে ব্রতী হয়, মানুষের উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ সুখ-শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ বোধ থেকে মানুষ মানুষের প্রতি সুবিচার করে; মানুষ মানুষের অধিকার দিয়ে দেয়, অধিকার সংরক্ষণ করে। এ বোধ থেকেই মানুষের অধিকার লুপ্তিত হলে, মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন হলে অপর মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা এর যথার্থ প্রতিকার ও প্রতিবিধানে এগিয়ে আসে। সৃষ্টি জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন, “আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি”।

সৃষ্টির সেরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জন্মগত ও বংশগত অধিকার শুধু নয় বরং মূলত তার বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি মানবিক গুণের কারণে মানুষের জন্য মানুষের সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধ তথা একজন অপর জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও তার দুঃখ দূর করার আশ্রয় চেষ্টা করা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করে।

বস্তুত সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। এই ইবাদাতের জন্যই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বানী- “আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাইনা যে, তারা আমার আহ্বায় যোগাবে।”

আর এ মানবতাবোধ যখন মানুষের মাঝে থাকে না তখন মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করে। মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে, মানুষ মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দেয়। মানুষের দুঃখ-কষ্টে সে ব্যথিত হয় না। মানুষ মানব কল্যাণে এগিয়ে আসে না, মানব সেবায় ব্রতী হয়না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় হিংস্রতা-নিষ্ঠুরতা, পাশগুতা, অমানবিকতা এবং পাশবিকতা। আল-কোরআনের দৃষ্টিতে এদের অবস্থা হল- “আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নমের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তাতে বোধ নেই। তাদের চোখ আছে বটে কিন্তু তাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই। তাদের কান আছে বটে, কিন্তু তাতে শ্রবণশক্তি নেই। এদের অবস্থা হল পশুর মতো বরং পশুর চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। ওরা চরম চেতনাবোধহীন”।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সাথে মানুষের মৌলিক ও প্রকৃত সম্পর্কগুলো হল, মানবিক সম্পর্ক, রক্ত বা আত্মীয়তার সম্পর্ক, ঈমানী বা বিশ্বাসগত সম্পর্ক। এ সম্পর্কগুলি যদি মানব সমাজে দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া-মায়্যা এবং দরদ, ভালবাসার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই মানব সমাজে নেমে আসবে অনাবিল সুখ, শান্তি আর উন্নতি। কিন্তু এ সম্পর্কগুলো যদি ওসব মহৎ গুণাবলীর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, এগুলো যদি দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়, যুলুম, নিপীড়ন, অবিচার, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কবলে আপতিত হয়, তবে মানব সমাজে সুখ-শান্তি ও উন্নতি আসবে না, আসতে পারে না, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে মানুষে কোন প্রভেদ নেই, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, কোন বৈষম্য নেই। বংশ, বর্ণ ও শ্রেণীগত কোন ভেদাভেদ নেই। কেউ উঁচু নয়, কেউ নিচু নয়, কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ দাস নয়, কেউ মনিব নয়। কেউ পবিত্র নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। মানুষ হিসাবে সব মানুষ সমান। মানুষ হিসেবে সব মানুষের সৃষ্টিসূত্র এক

ও অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষ সমান। সব মানুষের সাথে সব মানুষের রয়েছে জন্মসূত্রগত এক চিরন্তন শাস্ত্র সম্পর্ক। যেমন, আল-কোরআনে এসেছে- “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন”।

মানব জাতির এ সম্পর্ক বৈষম্যহীন, এ সম্পর্ক মানবিক সম্পর্ক, মনুষ্যত্বের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক। মানুষ মানুষে এই জন্মগত ও প্রাকৃতিক মানবিক সম্পর্কের কারণেই মানুষের মধ্যে মানবতাবোধের সৃষ্টি হয়। এবোধ জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে। অতঃপর পরিবেশ, শিক্ষা ও অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে তা হয়ত বিকশিত হয়, ময়ত চাপা পড়ে যায়। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে মানুষের একটা বোধ অন্তর্গত করে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষের মধ্যে যেমন বিবেকবোধ দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন সীমালঙ্ঘনের প্রবণতা। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে যেন তার বিবেকবোধকে জাগ্রত করে এবং পরিচ্ছন্ন ও বিকশিত করে তোলে। আবার সে যেন তার সীমালঙ্ঘনের প্রবণতাকে সংযত, সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। মানবতাবোধ একটি নৈতিকবোধ হলেও ইসলাম এটাকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের উপর মানুষের কতিপয় অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের নির্দেশ করেছে। সেগুলো সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছে। সেগুলোর লঙ্ঘন আইনগত ও শাস্তিমূলক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।

মানুষের উপর মানুষের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। যেমন- জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, চিন্তা ও কথা বলার অধিকার, কর্ম-উপার্জন এবং জীবিকার অধিকার। ইজ্জত, অক্ল, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার। শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার অধিকার। ভ্রমণ, বিয়ে-শাদী, সন্তান লালন-পালন ও সামাজিক সম্পর্কের অধিকার ইত্যাদি। এ সব অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি একদিকে যেমন মানুষের মানবিক ও নৈতিক বোধ থেকেই উৎসারিত হয়, ঠিক তেমনি ইসলাম এসব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এগুলো সংরক্ষণের

ব্যবস্থা আইনগতভাবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। নৈতিক ও বিবেকবোধ তথা মানবতাবোধ থেকেই যদি মানুষের প্রতি মানুষের এসব কর্তব্য চেতনা সৃষ্টি হয়, তবেই সমাজে নেমে আসতে পারে মানবপ্রেমের অনাবিল শান্তির এক নির্মল পরিবেশ। কেননা ইসলাম মূলতই মানবতার ধর্ম, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। আল-কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “এটা আমি এ জন্য পাঠিয়েছি যেন মানুষ তার ন্যায় অধিকার লাভ করে ও মানব সমাজ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়”।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন- “তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা কল্যাণকর কাজের আদেশ করবে আর অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে। এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস করবে। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী”।

সুতরাং দেখা যায়, ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেই মানবকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যখন মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, তখন সেটা হয় প্রকৃত মানবতাবোধ। এর সাথে কোন বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত থাকে না। এ নিঃস্বার্থ চেতনা ও মানবতাবোধই ইসলাম মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়। এ মানবতাবোধের তাগিদেই মানব সমাজে গড়ে উঠেছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত সেটাই ইসলাম তথা ইসলামের প্রকৃত রূপ।

ইসলাম : শান্তি ও মানবতার ধর্ম

বিশ্বে ইসলামই একমাত্র মহান ধর্ম, যার মর্মবাণী হল শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতা। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এবং মানুষে মানুষে শান্তি স্থাপনই ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইহজাগতিক শান্তির মধ্য দিয়ে পরকালীন শান্তির লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই ইসলামের মূল সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। ইসলাম শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ‘সালম’ থেকে। ‘সালম’ অর্থ শান্তি। এ অর্থে ইসলাম বলতে বুঝায় উচ্চতম আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। কারণ এভাবে শুধু শান্তি অর্জন করা যায়। শান্তি কথাটিকে বুঝতে হবে প্রচলিত অর্থের চেয়ে এক

ব্যাপকতর অর্থে। এ অর্থে শান্তি বলতে বুঝায়, আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগ ও আনুগত্যকে। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন বিরোধী প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং এভাবে মানসিক শান্তি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি অর্জন ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য নয়। নিজের শান্তি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠাও জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিবাদমান শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি সত্তাকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সাহায্যে আত্মশৃঙ্খলা অর্জনের পথই যথার্থ ইসলাম।

ধর্ম হিসেবে ইসলামের মৌলনীতি আল্লাহর একত্ব। পরিবেশের প্রতি এবং অন্যান্য মানুষ ও আল্লাহর প্রতি এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিই ইসলাম। আল-কোরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় ইসলাম। আর এর অনুসারীদের বলা হয় মুসলিম। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হল ইসলাম। ইসলাম বলতে বুঝায় শান্তির পথে অনুপ্রবেশ, মুসলিম বলতে বুঝায় আল্লাহর ও মানবাত্মার সাথে শান্তি স্থাপন। মানবাত্মার সাথে শান্তির অর্থ মানুষের জন্য সংকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় হতে বিরত থাকা। আল্লাহ বলেছেন, “যে আল্লাহর নিকট নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং অন্যের মঙ্গল সাধন করে, তজ্জন্য তার প্রভুর নিকট হতে পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা সন্তুষ্ট হবে না”।

আল্লাহর একত্ব ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের এই দুই মৌলিক বিধান ইসলামের শান্তির কথা প্রমাণ করে। শান্তিই হল ইসলামের মূলমন্ত্র। কারণ এই শান্তির পথেই ইসলামের উদ্ভব এবং এই শান্তিই এর শেষ ফলশ্রুতি। অতএব, ইসলাম মূলত শান্তির ধর্ম। মানুষকে অধিকতর সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা ইসলামের মূল লক্ষ্য। প্রকৃতির সবকিছুর মত মানুষের মধ্যে ও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এ সকল সুপ্ত গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনে মানুষকে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছে এবং এর মাধ্যমে সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। মানুষের মধ্যে মানবিক বৃত্তির পূর্ণতা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে এবং এই পূর্ণাঙ্গতা তাকে মুক্তি লাভে

সাহায্য করে।

ইসলামের আরেকটি উদ্দেশ্য হল সর্ব শক্তিমান পরমসত্তা আল্লাহর স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করা। সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মাখলুকাত) ও আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে মানুষকে সৃষ্টির সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করবে এবং একমাত্র তাঁরই আদেশ মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করবে। সে প্রাকৃতিক বা অন্য কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবে না। এর অন্যথা হলে মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অবনতি ডেকে আনবে। এভাবেই মানুষ আল্লাহর সাথে শান্তি বজায় রেখে স্বীয় পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। আবার ইসলাম যেমন আল্লাহর সাথে শান্তির কথা বলে, তেমনি তা সমগ্র বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতেও আগ্রহী। এর অর্থ মানুষ একজন অন্যজন হতে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবেনা। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়। পিতার প্রতি পুত্রের ও পুত্রের প্রতি পিতার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, ভ্রাত্যের প্রতি ভ্রাতৃর ও ভ্রাতৃর প্রতি ভ্রাত্যের, একজন মুসলমানের প্রতি আর একজন মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখাই হল এ সকল নির্দেশিত কর্তব্যের মৌলিক উদ্দেশ্য। তাই গবেষক, পণ্ডিত আবুল হাশিম তাঁর The Creed of Islam গ্রন্থে বলেছেন- "Islam does not suppress or oppress human nature but fully recognises the natural demand of the body, mind and intellect and induces harmonious development of all the faculties of man so that the ego might get full satisfaction of natural needs of man without infringing similar rights of other."

উপরোক্ত বাক্যমালার মূল বক্তব্য হলো- ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখেনা বা তার উপর জোর যুলুম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসামঞ্জস্য বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাভাবিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।

অতঃপর ইসলাম যে জিনিসটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তা হল মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য। সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই, এটাই ইসলামের বিঘোষিত নীতি। ইসলাম এমন এক ব্যাপক ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি স্থাপন করেছে সেখানে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কারণেই একজন অন্যজনের অধিকারকে পদদলিত করতে পারে না। মানবতার দর্শন হিসেবে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে প্রভেদ মানে না। অমুসলিমগণকেও ইসলাম তার সমাজ কাঠামো হতে বিচ্ছিন্ন করেনি। এক আল্লাহর অধীনে ইসলাম সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে চায়। মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে ভৌগোলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের উর্দ্ধে একটি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে শান্তি আনয়নই ইসলামের লক্ষ্য। মানুষের প্রগতির ধারণায় নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় রকমের অগ্রগতি এবং আধুনিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তা পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। গুরু থেকেই ইসলাম এ লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সমকালীন অবস্থার উপযোগী প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা করেছে।

মানব সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে ঐক্যবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ। তাই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইসলাম নূতন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছে। ইসলামের ঐক্যবন্ধন কেবল দেশ ও জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা সমগ্র মানব জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে আগ্রহী। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, সর্বোপরি ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম মানবজাতির ঐক্য বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ জন্যই ইসলাম তার নীতি ঘোষণা করেছে, মানুষ মাত্রই সমান। জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই। একমাত্র কর্মই মানুষের মর্যাদাকে চিহ্নিত করে। এ কর্ম ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, মানবতার জন্য। এ সকল কর্মে যে সফল, সেই ইসলামে সত্যিকার মর্যাদাশীল মানুষ। ইসলামে জাতিগত প্রাধান্য নেই, গোত্র, বর্ণ, সামাজিক পদমর্যাদা ও পেশার ক্ষেত্রেও ইসলাম কোন প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে প্রভেদ থাকতে পারে; কিন্তু তারা সবাই একই

সৃষ্টির সৃষ্টি। তাই তাদের সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের। ইসলামী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে ভাষাগত পার্থক্য, ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা কোন অন্তরায় নয়। ইসলাম বর্তমান বিশ্বের বর্ণবাদী, স্বদেশহিতৈষী ও জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক নৈতিক আদর্শবাদী ও আন্তর্জাতিক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে তৎপর। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক জন্ম সূত্রে নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতেই। জন্মসূত্রে মার্কিন বা আফ্রিকান, যোগসূত্রে ইয়াহুদী বা আর্য, বর্ণসূত্রে কৃষ্ণ বা শ্বেতকায় এবং ভাষাসূত্রে ভারতীয় বা আরবীয় যাই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলাকে যিনি প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশসমূহকে জীবনের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছেন তিনিই এই সমাজ ব্যবস্থায় শরীক হতে পারেন। এ সমাজে অংশ গ্রহণকারী সকলেই একই অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার। কোনরকম বর্ণগত বা জাতিগত ভেদাভেদের শিকার কেউই হবে না। উচ্চ নীচ বলে কেউই গণ্য হবে না এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে এমন কারও অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কীয় যে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় মানব জাতির অতীত কিংবা বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোথাও তা দেখা যায় না। অথচ এমন এক অবস্থা ও পরিবেশে ইসলামের এই অনুপম নীতি ঘোষিত হয় যখন পৃথিবীর অন্য সব স্থানের মত আরব দেশের মানুষও অসংখ্য পরিবার ও গোত্রে বিভক্ত ছিল। আর এসব পরিবার ও গোত্র একে অন্যের সাথে বিরামহীন পারিবারিক ও গোত্রীয় সংঘাতে লিপ্ত থাকত। একই পরিবার ও সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে সামাজিক বৈষম্য ছিল। ভাগ্যবান সম্পদশালী লোকেরা উঁচু সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান ভোগ করত এবং যারা ছিল রক্ত সম্পর্কে গোত্র প্রধানের ঘনিষ্ঠ তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল সকলের উপরে। পেশাগত বৈষম্যও তাদের মধ্যে ছিল। মূর্তিদের তত্ত্বাবধায়কগণ (পুরোহিত) ছিল আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান। তাই তারা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত। মজুর শ্রমীর মানুষকে তারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে ঘৃণার চোখে দেখত। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা আরবদের কাছে এত অপরিচিত ছিল যে, যৎ সামান্য উত্তেজনার বশে ভাই

ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাত। তাদের নারীরা ছিল তাদের অস্ত্রাবর সম্পত্তি। পুরুষ ও নারীর সমান মর্যাদার প্রশ্নই উঠেনা, আরব সমাজে মেয়েদের কোন মর্যাদাই ছিল না। ক্রীতদাসদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হত যেন তারা ভারবাহী পশু। পশুর উপর অত্যাচার বর্তমানে মানুষের মনে যে পরিমাণ অনুকম্পা জাগিয়ে তোলে, তখন ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার স্বাধীন মানুষের মনে সে পরিমাণ অনুকম্পাও জাগাত না। এ সব অসাম্যকে ভাগ্যের ফল ও দেবতাদের বিধান বলে মনে করা হত। এ সব সামাজিক অবিচার ধর্ম ও দর্শনের সমর্থন অনুমোদন লাভ করত। বহু বিবাহ, ব্যভিচার প্রভৃতি ছিল সেদিনের নিত্য নৈমিত্তিক আচরণ এবং যৌন নৈতিকতার মান এতই স্থূল ও নিম্ন ছিল যে, আরবরা সৎমা ও সৎ ছেলের এমনকি ভাই ও বোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অনুমোদন করত। মোটকথা, মদ্যপান, জুয়া, লুণ্ঠন, নির্যাতন, অন্যায় ও সামাজিক অসমতা ছিল সেদিনের আরবদের প্রচলিত আচার আচরণের অংশ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আবির্ভাবের আগে আরবদের নৈতিক ও বৈষয়িক অবস্থা ছিল যীশু খ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় অবস্থার চেয়েও খারাপ। অন্যায়, নির্যাতন ও শোষণের অষ্টোপাশে আবদ্ধ আরবের সাধারণ জনতা তখন আত্ননাশ করছিল এবং একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় ছিল। আর সেই ত্রাণকর্তাকেই তারা খুঁজে পেল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুমহান ব্যক্তিত্বে। ঐ সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা আরবদেশের অবস্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় হলেও তখন সমগ্র ইউরোপ ছিল মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। ভারতবর্ষে তখন পৌত্তলিকতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সতীদাহ, কালীদেবীর সামনে নরবলী, আঞ্চলিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি হয়ে উঠে বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে আত্ননাশ করছিল। বর্ণপ্রথা তখন এতই কঠোর ছিল যে, কোন শুদ্ধ যদি ব্রাহ্মণের পথ দিয়ে হেঁটে যেত, তাহলে তাকে ফাঁসি দেয়া হত। আদিম অধিবাসীদের সাথে ব্রাহ্মণদের উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তাভাষা দূরের কথা, এমনকি তারা তাদের ছায়াও মাড়াতে না। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পালিত কুকুর একজন আদিবাসীর চেয়েও বেশী সম্মান পায়।

মানুষে মানুষে এত প্রভেদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়নি। বহু ঈশ্বরবাদ, কুসংস্কার ও বহু বিবাহের ব্যাপারে ভারত ও আরবের অবস্থা ছিল একই। বস্তুত সারা পৃথিবী যখন বিরাজমান অশুভ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য উৎসুক ও অস্থির হয়ে পড়েছিল, তখনই ইসলাম ও এর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাব ঘটে একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণে।

এই বিষন্নময় অবস্থার মধ্যে শোনা গেল আল্লাহর কঠোর অথচ করুণাপূর্ণ কণ্ঠস্বর- আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ কণ্ঠস্বর কঠোর কারণ, মানুষে মানুষে মানব সৃষ্ট ভেদাভেদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার জন্য এটা অনমনীয় ও স্পষ্ট আদেশ। আর এটা করুণাপূর্ণ কারণ, এটা আল্লাহর সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্কের কথা, আল্লাহর প্রভুত্ব, মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা শিক্ষা দেয়। যে সব বাধা ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ইসলাম সে সব বাধাকে কার্যকরভাবে অপসারণ করে এবং এমন এক সমাজ ব্যবস্থা নির্ধারণ করে যাতে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব জীবন্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধর্মের জয়গান ও প্রচার করেন তা ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এটি এমন এক ধর্ম যেখানে জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় প্রভৃতি সব ভেদাভেদকে মানুষের চিন্তা ও চেতনা থেকে মুছে ফেলার কথা বলা হয়েছে। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাজিক অসমতা দূর করেন, নারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেন, ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন এবং মদ্যপান, জুয়া, রক্তপাত প্রভৃতি যেসব অসামাজিক প্রথা তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে প্রচলিত ছিল সেগুলো সবই কঠোর হাতে দমন করেন। একজন ব্যক্তির একার পক্ষে তাঁর জীবদ্দশায় সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে এতগুলো সংস্কার সম্পন্ন করা কি করে সম্ভব হল, তা ভাবতে গেলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। তাঁর ধারণাবলী ছিল প্রগতিশীল এবং তাঁর কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছিল মানবতার কল্যাণে। মানব জাতির মুক্তি ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও সততা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

চলবে

তারিখে নজদ ও হেজাজ (ওহাবী-কাওমিদের ইতিহাস)

মূল: মুফতী মুহাম্মদ আবদুল কাইউম হাজারভী কাদেরী
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

।। পনের ।।

ওলীগণের সম্মান করা সম্পর্কে হাদিস বিশারদ ইমাম
বোখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বর্ণনা আলোচনা করা
প্রয়োজন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
الله قال من عادى وليا فقد اذنته بالحرب-
হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন,
আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে ব্যক্তি আমার
ওলীদের সাথে দুষ্মানি করবে। আমি তার সাথে যুদ্ধ
ঘোষণা করছি।

কুরআন মজিদে বর্ণিত স্পষ্ট দলীল ও সহীহ হাদিস সমূহ
এবং ওহাবী মতাবলম্বীদের নির্ভরযোগ্য তফসীর সমূহ
এবং ইসলামে বিশ্বাসীদের আচরণ দ্বারা একথা
দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে যে, আশীয়া
আলাইহিস সালাম ও আওলীয়া কেরামগণের সম্মান
করা এবং তাঁদের নৈকট্য লাভে অভিলাসী হয়ে তাঁদের
নিকট শাফায়াত তলব করা আল্লাহর আদেশ ও তাঁর
উদ্দেশ্য। সাহাবীগণ এবং নেককার মুসলমানদের
অভ্যাসও তাই। বিশ্ব মুসলিমের নিকট ও এরূপ আচরণ
প্রশংসিত ও গ্রহণীয়। এখন কথা হলো যে, ইবনে ওহাব
ও তাঁর অনুসারীদের মতে এরূপ কাজ করা শিরক ও
কুফুরী। এরূপ আচরণের কারণে তারা মুসলমানদের কে
হত্যা করা ও তাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করা হালাল বা
বৈধ মনে করে। (তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহই
জ্ঞাত)।

সাহায্য ও সহায়তা প্রার্থনা করা

ইসলামে বিশ্বাসীদের ধারণা হচ্ছে যে, আশীয়া
আলাইহিস সালাম ও আওলীয়াদের নিকট তাঁদের
জীবিত থাকা কালীন সময় এবং তাঁদের ইহ জগত

ত্যাগের পর তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ।
এর বিপরীত ইবনে ওহাবের অভিমত হচ্ছে আশীয়া
আলাইহিস সালাম ও আওলীয়াদের নিকট তাঁদের
জীবিত থাকাকালীন সময় তাঁদের নিকটবর্তী হয়ে তাঁদের
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ। তাঁদের
অনুপস্থিতিতেও ইহ জগত ত্যাগের পর তাঁদের নিকট
সাহায্য প্রার্থনা করা নাজায়েজ। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত
হলো-

سبحان من طبع على قلوب اعدائه فان
الاستغاثة بالخلق فيما يقدر عليه لا
ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى
(فاستغاثة الذي من شيعة على الذين من
عدو) وكما يستغيث الانسان باصحابه في
الحرب او نميره في اشياء يقدر عليها
المخلوق ونحن انكرنا استغاثة العباداة
التي يفعلونها عند قبور الاولياء او في
غيبتهم في الاشياء التي لا يقدر عليها الا
الله-

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যিনি তাঁর দুষ্মনদের অন্তরকে
মোহরাক্ষিত করে দিয়েছেন, যে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি জীব
ক্ষমতার অধিকারী। ঐ সমস্ত বিষয় সৃষ্টি জীবের নিকট
সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ। আমি তা অস্বীকার
করছি। যথা আল্লাহ তালা হজরত মুসা আলাইহিস
সালাম এর ঘটনায় উল্লেখ করেছেন। হজরত মুসা
আলাইহিস সালাম এর কাউমের জনৈক ব্যক্তি তাঁর
নিকট দুষ্মনের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। অথবা
যুদ্ধের ময়দানে কোঁন ব্যক্তির অপরের নিকট সাহায্য
প্রার্থনা করা, যে বিষয় সে ক্ষমতার অধিকারী। আমি
সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করতে নিষেধ করছি। যারা
আওলীয়াদের কবরের নিকট গমন করে তাদের
অনুপস্থিতিতে তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। ঐ সমস্ত
বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোন প্রকার ক্ষমতার
অধিকারী নহে।

ইবনে ওহাবের এ অভিমত বিভিন্ন কারণে বাতিল বলে
প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথমতঃ ইবনে ওহাব জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য করার কারণে তা বাতিল হয়ে পড়েছে।

কেননা আল্লাহতালা ব্যতীত অপরের নিকট সাহায্য সহায়তা ও প্রার্থনা করা শিরক ও কুফুরী। তাহলে তাঁদের জীবিত থাকাকালীন সময় ও তাঁদের নিকট সাহায্য সহায়তা ও প্রার্থনা করা হবে কুফুরী। তাঁদের ইন্তেকালের পরও তাঁদের নিকট সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করা শিরক ও কুফুরী হবে। যদি তাঁদের জীবিত থাকাকালীন তাঁদের নিকট সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করা শিরক না হয়, তাহলে তাঁদের ইন্তেকালের পরও তাঁদের নিকট সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করা শিরক হবেনা।

দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতা ও অক্ষমতার পার্থক্য করার কারণে তা বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহতালা। আর আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার বলে আশীয়া (আঃ) ও আওলীয়াগণ জীবিত থাকা কালে ও ইহজগত ত্যাগের পর তাঁরা প্রার্থনাকারীকে সাহায্য করেন।

হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মুবারকের নিকট গমন করে সাহায্য প্রার্থনা করা

পূর্বে আমরা শাফায়াতের আলোচনায় হাফেজ ইবনে কাসীরের রচিত তফসীরে আতবীর বরাতে উল্লেখ করেছি, জনৈক বৈদুইনের হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মুবারকের নিকট গমন করে সাহায্য প্রার্থনা করার ঘটনা। এ ছাড়াও ইমাম বায়হাকী স্বীয় সূত্রে “দালায়েলুল নবুয়ত” নামক গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। আর আল্লামা সাবকীও বিস্তারিত সূত্রে “শিফাউস সিকাম” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

عن مالك الدار قال اصاب الناس قحط
في زمان عمر بن الخطاب رضى الله
عنه فجاء رجل الى قبر النبي صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
استسق الله لا متك فانهم قد هلكوا

فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى المنام فقال ايت عمر فاقرءه السلام
واخبره انهم مسقون وقل له عليك
الكيس الكيس فاتى الرجل عمر
فاخبره فبكى عمر رضى الله عنه ثم
قال يارب ما الوالا ما عجزت عنه-

হযরত মালেক দার বর্ণনা করে বলেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফত কালে আরবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন জনৈক ব্যক্তি হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মুবারকের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলঃ হে আল্লাহর রাসুল! (দঃ) আপনার উম্মাতের জন্য বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করুন। কেননা দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন যোগে বললেন, উমরের নিকট গমন করে তাকে আমার সালাম বলবে, আর তাকে সুসংবাদ দেবে যে, অবিলম্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। আর তাকে বলবে সে যেন বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করে। সে ব্যক্তি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট গমন করে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করল। এ ঘটনা শুনার পর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করলেন। এবং বললেন হে আল্লাহ! উমর ঐ কাজ ত্যাগ করেছে সে যা করতে অক্ষম।

উক্ত হাদিসকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী “আল এসাবা” ও হাফেজ ইবনে আবদুল বার “আল ইসতিয়াব” এবং ইমাম তিবরাণী “মুজামে সগীর” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত হাদিসের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মুবারকের নিকট গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। আর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনাও করছেন। কোন সাহাবী তাকে এ বিষয় কোন প্রকার জবাব দেহী করেনি। এমন কি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু না সুতরাং, একথায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মাঝারের নিকট

গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবীগণের অভ্যাস ছিল। কেননা উক্ত ঘটনাকে কোন প্রকার আশ্চর্য ঘটনায় মনে করা হয় নি।

অনুপস্থিত অবস্থায় সাহায্য প্রার্থনা করা

ইবনে ওহাবের অভিমত হলো যে, যখন কোন ব্যক্তি নিকটে অবস্থান করবে তখন তাঁর নিকট সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করা জায়েজ। আর যখন দূরে অবস্থান করবে অনুপস্থিত থাকবে তখন তার নিকট সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করা জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এরূপ পার্থক্য আরোপ করা বাতিল বলে ধরা পড়বে। কেননা যা নিকটবর্তী হবে তাও শিরক হবে। তার দূরবর্তী হবার কারণেও শিরক বলে গণ্য হবে। এছাড়াও সহীহ হাদিসের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ দূরে অবস্থান করার সময় এবং অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় ও সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করেছেন, যথা ইমাম বোখারী (১) কাজী আয়াজ (২) ও অন্যান্য হাদিস বেত্তাগণ উল্লেখ করেছেন-

خدرت رجل ابن عمر فقال رجل انكر
احب الناس اليك فقال يا محمد و في
رواية فصاح يا محمداه فانشرت اجله-

হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পা অবশ হয়ে যায়। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে ব্যক্তি প্রিয়! তাঁকে স্মরণ কর। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার দিয়ে বলল! হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে তাঁর পা সবল হয়ে গেল।

হজরত মোল্লা আলী কারী (৩) শরহে শিফা নামক গ্রন্থে 'ইয়া মুহাম্মাদাহ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-

قصد به اظهار المحبة في ضمن
الاستغاثة

হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহব্বতের যোগে সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য "ইয়া মুহাম্মাদাহ"

বলেছেন।

উক্ত হাদিসের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনুপস্থিত অবস্থায় ও সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করা সাহাবীদের অভ্যাস ছিল। আর যে বিষয় সাহাবীগণ অভ্যস্ত ছিলেন, সে বিষয় আমল করা অর্থাৎ সঠিক রাস্তায় চলা। সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কাজ করার জন্য অন্য রাস্তা খোজার অর্থ হচ্ছে সাহাবীগণের অভ্যাসকে ভুল মনে করা। একজনকে শিরক বলে অভিহিত করা নিছক অজ্ঞতা বৈ আর কিছুই নয়।

ক্ষমতা ও অক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করা

ইবনে ওহাবের মতে সমস্ত মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েজ। যা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে, যথা হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকট জনৈক ইসরাঈল বংশীয় ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া, বা যুদ্ধের মাঠে বন্ধুর নিকট সাহায্য চাওয়া। তার অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত কাজে স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষ অক্ষম ঐ সমস্ত বিষয় মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েজ নেই। ইবনে ওহাবের এরূপ পার্থক্য করা সরাসরি কুরআন মজীদের বিরোধী।

বিলকিছের দেশ ছিল ইয়ামান। তা বায়তুল মোকাদ্দাস হতে কয়েক শত মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম রাণীর সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য দরবারে উপস্থিত লোকদেরকে আদেশ করলেন-

ايها الملاء ايكة ياتيني بعروشها قبل ان
ياتوني مسلمين-

হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর অধিনস্থগণকে ডেকে বললেন, রাণী বিলকিস আমার নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্বে তার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছে দিতে পারবে কে? এটা ঐ সময়ের কথা যখন রাণী সদল বলে হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এর দরবারে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা করেছে। তখন এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী জ্বিন বললো আমি আপনার দরবার থেকে উঠে যাবার পূর্বেই সিংহাসনটিকে নিয়ে আসতে পারব।

قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل
ان تقوم من مقامك-

সে বলল! আমি এর চেয়েও অনেক আগে নিয়ে আসতে চাই। তখন হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এর উপদেষ্টা আসেফ বিন বরখীয়া বলল, (কোরআন)

انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك

আমি চক্ষুর পলক খোলার পূর্বে তা নিয়ে আসতে সক্ষম। বাস্তবে তাই হয়েছে হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এর দরবার শেষ হবার পূর্বে রাণী বিলকিসের সিংহাসন উপস্থিত করার আশা করেছেন। আর তাঁর উপদেষ্টা আসেফ বিন বরখীয়ার চক্ষুর পলক শেষ করার পূর্বে তা নিয়ে আসা। চাই তা হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এর মোজেজাই হোক, বা আসেফ বিন বরখীয়ার কেরামতই হউক। উক্ত ঘটনা প্রবাহের দ্বারা মোটামুটি ভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সমস্ত কাজে সাধারণ লোকের কোন ক্ষমতা নেই। ঐ সমস্ত কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে আওলীয়ায়ে কেরামদের নিকট প্রত্যাবর্তন করা সঠিক ও হিদায়াতের পূর্ণাংগ পদাঙ্ক অনুসরণ।

নতুবা হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর উপস্থিত সভাসদ ও পরিষদের নিকট এ কথা বলতেন না, আমার বৈঠক শেষ হবার পূর্বে সিংহাসন আমার নিকট উপস্থিত করা চাই। নচেৎ পবিত্র কুরআন মজীদেও এ ঘটনা উল্লেখ করা হত না। বরং কুরআন মজীদে এ ঘটনাকে উল্লেখ করার মাধ্যমে একথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, যে সমস্ত বিষয় জ্ঞান অর্জন করা সাধারণ লোকের ক্ষমতার মধ্যে নহে তা অর্জন করার জন্য আওলীয়া কেরামদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েজ।

হজরত ময়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার

মাঝারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা

পূর্বে আমরা আওলীয়া কেরামদের নিকট তাঁদের জীবিত থাকাকালীন সময় এই বিষয় সাহায্য প্রার্থনার দলীল সমূহ আলোচনা করেছি। যা সাধারণ লোকের ক্ষমতার বাইরে। এখন তাঁদের ইহ জগত ত্যাগের পর তাঁদের নিকট ঐ সমস্ত বিষয় অর্জন করার সাহায্য প্রার্থনার

দলীল সমূহ উল্লেখ করছি। যা সাধারণ লোকের ক্ষমতার মধ্যে নেই। সৈয়দ আহমদ বেরলভী মৃত্যু ১২৫৬ হিজরী সনে। আকীদা বিশ্বাসে তিনি ইবনে ওহাবের অনুসারী ছিলেন। যথা শায়েখ আত্তার বলেন। ভারত বর্ষে সৈয়দ আহমদ বেরলভী উক্ত মিশনকে প্রচার করে তথাকার কাফিরদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী ওহাবী বুজর্গদের বর্ণনার অনুসারী মুসলমানদের) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

সৈয়দ মুহাম্মদ আলী সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের মুরীদ ও শিষ্য ছিলো। সৈয়দ আহমদ তাকে ভীষণ উন্নততর করেছে। সৈয়দ আহমদ বেরলভী তার নিজের ভাষায় উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ সৈয়দ মুহাম্মদ আলীকে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর হাতে বয়াত করার উকিল নিযুক্ত করেছেন। (মাখজানে আহমদী ৬০ পৃঃ)

অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ বেরলভী ইবনে ওহাবের নিম্নতম বংশধর ছিলেন। আর সৈয়দ মুহাম্মদ আলী সৈয়দ আহমদের প্রিয়তম শিষ্য ছিল। মোটকথা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী ও সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ন্যায় ইবনে ওহাবের অনুসারী ছিল। সৈয়দ মুহাম্মদ আলী ও ইবনে ওহাবের বংশধর ছিল। সুতরাং তার কথায় ও ইবনে ওহাবের সমর্থন পাওয়া যায়। দেখা যাক সে কি বলে।

অর্ধ রজনীতে আমি “সরফ” নামক স্থানে উম্মুল মুমেনীন সৈয়দাহ হজরত ময়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা মাঝারের নিকট গমন করি। আল্লাহতালা তাঁর ও তাঁর স্বামী হজরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। ঘটনা চক্রে ঐ দিন আমার নিকট খাদ্য ও পানীয় কিছুই ছিল না।

ঘুম থেকে উঠার পর আমার ভীষণ ক্ষিধে পেলো। ক্ষিধের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এমন কি চেহারাও বিমর্ষ হয়ে পড়লো। ক্ষিধের তাড়নায় আমি অনেকের নিকট গমনও করে। কিন্তু কোথাও কোন খাদ্য পাইনি। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আমি হজরত ময়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাঝার জিয়ারত করি এবং নিঃসম্বল অবস্থায় আমি শোক গাথা পাঠ করতে শুরু করি এবং আমি তাঁর নিকট আবেদন করিঃ হে পিতামহী, আমি আপনার মেহমান আমাকে কিছু খাদ্য দান করুন। আপনার দয়া দাক্ষিন্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। অতঃপর আমি সালাম করে ফাতেহা পাঠ করে তাঁর আত্মার উপর সওয়াব বখশিশ করি। এবং তার মাঝারের

উপর মাথা রেখে দেই। মহান আল্লাহতালা যিনি হলেন চূড়ান্তরূপে জীবিকার মালিক। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাঁর নিকট থেকে আমি দুটি তাজা আঙ্গুরের চড়ি লাভ করি। আশ্চর্য জনক কথা হলো যে তখন শীতকাল ছিল। আঙ্গুরের কোন মৌসুমই ছিল না। উক্ত চড়ি থেকে কিছু আঙ্গুর আমি সেখানে ভক্ষণ করি। অবশিষ্ট আঙ্গুর সমূহ আমি হুজরা থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রত্যেককে একটি করে বটন করে দেই।

হজরত মরিয়ম গ্রীষ্ম কালে আল্লাহর ফজলে বিহিশতের ফল পেয়েছেন। তাঁর এ কেরামত তাঁর জীবিতকালে শুধু প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ইন্তেকালের পর এরূপ কেরামত তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয় নি। হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মীনির ইহ জগত ত্যাগের দীর্ঘ দিন পরও, আমি তার দ্বারা এ রূপ কেরামত প্রাপ্ত হয়েছি। এবং হাজার নিয়ামত পাবার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছি। (১)

লক্ষনীয় বিষয় হলো যে, মাঝারের নিকট থেকে সাহায্য সহায়তা পাবার এ হলো নমুনা। যাকে ওহাবী মতাবলম্বীগণ তাদের ভাষায় কুফুরী ও শিরক বলতে কুষ্ঠা বোধ করেনা। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও মাখজনে আহদীর রচয়িতা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী ও উম্মুল মুমিনের মাঝারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এবং উক্ত ঘটনাকে সৈয়দ আহমদের জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর পরও তারা কটর তাওহীদে বিশ্বাসীগণকে বিদাতের প্রচলন কারীও অংশীবাদী উপাধিতে ভূষিত করছে। আর অন্যান্য মুসলমানগণ যদি এরূপ কাজ করে তাহলে তাদেরকে কাফির মুশরিক বলে হত্যা করা এবং তাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করা বৈধ বলে ঘোষণা করছে।

ইবনে ওহাব সম্পর্কে বিশ্ব

মুসলিমদের অভিমত

ইবনে ওহাব তার মনগড়া মতবাদকে ইসলামী বিশ্বে প্রচার করেছে। সে তার মতবাদের বিরোধীতা করায় মুসলমানদিগকে কাফির বলে, তাদের হত্যাকরা অত্যাবশ্যক বলে উল্লেখ করেছে। সুযোগ মত সে কখনও ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করতে কুষ্ঠাবোধ করেনি। ইবনে ওহাব কর্তৃক সাধারণভাবে জনসাধারণকে কাফির বলা ও তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তখন থেকে অদ্যাবধি

ওলামাগণ তার অভিমত বাতিল বলে তাদের লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আমরা পাঠক সমাজের নিকট উক্ত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্য হতে কতিপয় গ্রন্থে উল্লেখিত সারমর্ম উল্লেখ করছি। তাই প্রথমে ইবনে ওহাবের (মৃত্যু ১২০৬ হিঃ) তার সহোদর ভ্রাতা সোলাইমান বিন আবদুল ওহাবের (মৃত্যু ১২০৮ হিঃ) বহুল প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আস সাওয়াকে উলহীয়া” নামক গ্রন্থে উল্লেখিত কতিপয় অধ্যায়ের বর্ণনা উল্লেখ করছি।

শাইখ সোলাইমান বিন আবদুল ওহাব (মৃত্যু ১২০৮ হিঃ)

সোলাইমান বিন আবদুল ওহাব শাইখ নজদীর মুসলমানদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে উল্লেখ করে বলেন :

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রমাণে

মুসলমানদের কাফির বলার প্রতিবাদ

তোমার আকায়েদ ও মুসলমানদেরকে কাফির বলে উল্লেখ করা এ কারণেই সঠিক নয় যে, তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দান করার পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ হলো নামাজ। তা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, তার সম্পর্কে ফিক্‌হা বিদগণ অভিমত প্রকাশ করছেন যে, আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তির নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং সে বলে থাকে যে, আমি অন্যান্য অংশীবাদীদের তুলনায় স্বীয় অংশীবাদীতায় নির্ভিক। যে ব্যক্তি স্বীয় কর্মে আমার সাথে অন্যকে অংশীদার স্থির করবে আমি তার কর্ম ও অংশীবাদিতাকে ত্যাগ করেছে। আর কিয়ামতের মাঠে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত কারীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলবেন, যাও! তুমি যার উদ্দেশ্যে ইবাদত করেছ তার নিকট থেকে তোমার পারিশ্রমিকের বিনিময় গ্রহণ কর। এরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে ইসলামী ফিক্‌হা বিদগণের অভিমত হচ্ছে, তার কর্ম নিঃফল হবে। তাকে হত্যা করতে হবে এমন কথা বলেননি। এবং তার ধন সম্পদ লুণ্ঠন করার কথাও বলেননি। অথচ তুমি তার চেয়ে অতি তুচ্ছ বিষয়কে কুফুরী বলে উল্লেখ করছ। (চলবে)

জানতে চাই...
জানাতে চাই...

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

দু'টির বেশী প্রশ্ন গৃহীত হবে না। সাদা কাগজের পূর্ণ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তর দাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।
প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা : প্রশ্নোত্তর বিভাগ, কানযুল ইমান, ২০৫/৫, ফকিরাপুল, আল-বশির প্লাজা (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
email : kanjuliman@yahoo.com

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন মঞ্জু, মিরপুর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ বিগত তিন/চার বছর ধরে আমাদের আর্থিক ও লেখাপড়ার অবস্থা অবনতির দিকে। এ কারণে জনৈক হুজুরের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম আমাদের নাকি তাবীজ-দু'আ করা হয়েছে, যে কারণে আমাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে। তাই, কোরআন হাদীস মুতাবেক কি আমলের বরকতে আমাদের এ দুর্ভাবস্থা দূর হবে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তরঃ আপনি যথাযথভাবে পাঞ্জিগানা নামায আদায় করুন এবং একনিষ্ট মনে মহান আল্লাহর দরবারে তাওবা করুন এবং ফরিয়াদ করুন যাতে আল্লাহ তা'আলা এ বিপদ থেকে আপনাকে মুক্তি দেন। যদি সম্ভব হয় তবে কোন খাঁটি সুন্নী আলেমের নিকট হতে কিছু দু'আ ও দুরূদ শিখে তদনুযায়ী আ'মল করার পরামর্শ রইল। আউলিয়া-ই কেরামের মাযার শরীফ যিয়ারত করার পরামর্শ রইল। পরম করুণাময় যেন তাঁর প্রিয় ওলীদের ওসীলায় আপনার মুশকিল আসান করে দেন।

আবদুল খালেক, শাহজাহানপুর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ আমাদে মাঝে কতক আলেম হাফেয খতমে গাউসিয়া শরীফ, শাজরা শরীফ মতে পড়ে না। তারা তাদের মনগড়াভাবে পড়ে। কিভাবে পড়লে খতমে

গাউসিয়া শরীফ আদায় হবে জানালে খুশী হব।

উত্তরঃ আমাদের সিলসিলায় প্রদত্ত শাজরা শরীফে যে নিয়ম খতমে গাউসিয়া শরীফ আদায় করতে বলা হয়েছে আমাদের পীরভাইয়েরা সে নিয়মে আদায় করবে। তবে কেউ যদি মানুষজন আসার জন্য খতমে গাউসিয়া শরীফ শুরু করার পূর্বে হাম্দের-না'ত-কসীদা ইত্যাদি পড়লে কোন অসুবিধা নাই, বরং নফল ইবাদতের সাওয়াব পাবে।

মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম, কচুয়া চাঁদপুর

প্রশ্নঃ আমি এক মসজিদের খতীব। আমার কাপড়গুলো বিধর্মীদের লজ্জীতে ধোলাই করে ঐ কাপড় পড়েই নামায পড়তে ও পড়াতে হয়। বিধর্মীদের ধোয়া কাপড়ে আদায় কৃত ইবাদত-বন্দেগীর উপর কোন প্রভাব পড়ে? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানানোর অন্যতম অনুরোধ রইল।

উত্তরঃ নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হল-কাপড় ও স্থান পবিত্র হওয়া। অপবিত্র কাপড় দ্বারা নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। তাই সকলের উচিত কাপড় পবিত্র করে নেওয়া। এমতাবস্থায় কাপড় লজ্জীর ধোপা যদি বিধর্মী হয়, তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে যদি এটা জানা থাকে যে, উক্ত ধোপা নাপাক বস্তু দ্বারা কাপড় পরিস্কার করে তবে তাকে কাপড় ধুতে দিবে না। বরং যে পবিত্রতার প্রতি লক্ষ রাখে তাকেই ধুতে দিবে। উল্লেখ্য, মুসলিম ধোপা পাওয়া গেলে অমুসলিম ধোপাকে কাপড় দিবে না। মুসলিম ধোপা পাওয়া না গেলে অমুসলিম ধোপার নিকট কাপড় দেওয়া যায়। যেহেতু এতটুকু বিশ্বাস আছে যে, অমুসলিম ধোপা পবিত্র পানি দিয়ে কাপড় পরিস্কার করে। এতটুকু যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ আব্দুল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে পাকে মুসলমানদেরকে নামায কয়েম করার জন্য বলেছেন। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে- ধাত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর নামায ফরয। ছেলে হোক মেয়ে হোক ৭ বৎসরে নামাযের তাকীদ দিতে বলেছেন এবং ১০ বৎসরে নামায পড়ার জন্য শাস্তি দিতে বলেছেন।

এখন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা নিয়মিত নামায আদায় করেনা। তারা সপ্তাহে, মাসে বা বছরের বিশেষ দিনগুলোতে নামায পড়ে থাকে। এ অনিয়মিত নামাযীরা

সাওয়াবের অধিকারী হবে কিনা জানতে আগ্রহী।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। নামায ছাড়া অন্য কোন ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ এরূপ অধিক আয়াত নাযিল করেননি। এ ছাড়া প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে, যাতে মুমিনদেরকে নামায পড়ার ও বিশুদ্ধভাবে তা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরতে আউলিয়া-ই কেরাম বিশেষত নামায ও বেশি বেশি নফল ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের জান্নাত লাভ করতে চাইলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীকে নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ বিতর-জুমা ইত্যাদি আদায় করতে হবে। তবে কেউ যদি নামায ফরজ হওয়ার পরও নামায না পড়ে, অথবা শুধু জুমা ও অন্যান্য বাৎসরিক নামায পড়ে তবে তাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় না করার কারণে সাওয়াবতো দূরের কথা তাকে আখিরাতে ভীষণ কঠোরতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। যা বিভিন্ন হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে। তাই আমাদের সকলের উচিত নামাযের প্রতি আরো যত্নবান হওয়া এবং কাজা না হওয়ার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম, আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া

প্রশ্নঃ এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে সালাম দেওয়া কর্তব্য। তাই আমরা একে অন্যকে যেখানে দেখি সালাম দিয়ে থাকি। অনেক সময় কতক মানুষের চেহারার মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বুঝা যায়না। তাহলে আমি যাকে সালাম দিলাম সে যদি হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমার কি গুনাহ হবে? লোকটি অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাকে কি সালাম দেব নাকি তার ধর্মানুযায়ী সন্তোষ জানাব। এ ব্যাপারে যথার্থ উত্তর দিলে উপকৃত হব।

উত্তরঃ একজন মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের সাক্ষাত হলে পরস্পর সালাম বিনিময় করা আমাদের প্রিয়নবীর একটি অন্যতম সুন্নাত। মূলতঃ এটা ইসলামে সৌন্দর্য ও মহান আদর্শ। তবে কোন স্থানে যদি মুসলমান ও অমুসলিম একত্রে থাকে তাহলে ঐ স্থানে সালাম দেওয়ার সময় বলতে হয় 'আসসালামু আলা

মানিত্ তাবা'আল্ হুদা' অর্থাৎ যারা হেদায়াতের অনুসরণ করে তাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। আর হিন্দু-মুসলিম পরিচয় না থাকলে অন্তরে মুসলিম বলে সাক্ষ্য দিলে তখন ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। আর অমুসলিমকে যদি একান্ত সন্তোষ জানাতেই হয় এবং সে যদি কোন মুসলিমকে সালাম দেয়, তখন জবাবে মুসলমান বলবে 'ওয়া আলাইকুম'। জেনে শুনে কোন বিধর্মীকে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। [মিশকাতুল মাসাবীহ ও মেরকাতুল মাফাতীহ]

প্রশ্নঃ আমরা জানি প্রতি পিতামাতা তার নিজ নিজ সন্তান'র কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু বর্তমানে কিছু পরিবারের ক্ষেত্রে লক্ষ করি কুচক্রি লোকের পাল্লায় পড়ে তার সন্তান'র নামে বদনাম ছড়ায়। তবুও সন্তান যদি তার পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করে, তখন যদি এসব পিতামাতা সন্তানের কর্তব্যকে মেনে না নেয়া বা অস্বীকার করে, তাহলে সন্তানের কী করা উচিত? এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে বললে উপকৃত হতাম।

উত্তরঃ কোন মাতাপিতা তার আপন সন্তানের অকল্যাণ কামনা করেনা। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা মনে হয়, তার মধ্যে হয়ত কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। তাই পিতামাতা সন্তানকে যতই ভুল বুঝুক না কেন, সন্তানের উচিত পিতামাতার সাথে সবসময় সদাচরণ করা, নিম্নস্বরে কথা বলা। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে- পিতামাতা যতি অমুসলিমও হন আর সন্তান যদি মুসলমান হয়, তাহলে তাদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করবে। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত সর্ব অবস্থায় পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করে তাদের দু'আ হাসিল করা।

মুহাম্মদ আলী আহমদ, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

প্রশ্নঃ বসে নামায পড়লে যদি নামায শুদ্ধ হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে ও বসে নামায পড়ার মধ্যে পার্থক্য কি? কিছু লোক দেখা যায় তারা নফল নামায বসে বসে পড়ছে। উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তরঃ সক্ষমতা থাকা অবস্থায় ফরজ ও ওয়াজিব নামায বসে পড়া নাজায়েয। যেহেতু 'দাঁড়ানো' নামাযের একটি রুকন। তবে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু নামায বসে পড়ার

সাওয়াব দাড়িয়ে নামায পড়ার সাওয়াবের অর্ধেক।

আফরোজা আক্তার, নাজিমউদ্দিন রোড, ঢাকা।

প্রশ্নঃ ‘স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত’ কথাটি কতটুকু সত্য কোরআন-হাদীসের আলোকে জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তরঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। এটি হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। আর যে স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তার জান্নাত পাওয়ার সুসংবাদ ও আল্লাহর হাবীরের মহানবাণী দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু ‘স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর জন্য বেহেশত’-এ কথা বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনায় পওয়া যায়না। কিন্তু এর মর্মার্থ হল আল্লাহ-রসূল প্রদত্ত বিধি-বিধানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ মুসলমান স্বামীর সন্তুষ্টিতেই স্ত্রীর বেহেশত।

মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

প্রশ্নঃ কাদিয়ানীদেরকে কেন কাফির বলা হয়? এরা তো নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সবইতো পালন করে থাকে। প্রচলিত আছে, কাফিরকেও নাকি কাফির বলা যাবেনা। বিশুদ্ধ উত্তর জানিয়ে ঈমান-আমল রক্ষা করতে বাধিত করবেন।

উত্তরঃ কাদিয়ানীদের প্রতিষ্ঠাতা তথা মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী হিসেবে মনতে অস্বীকার করেছে। যা পবিত্র কোরআন ও অসংখ্য হাদীসে রসূল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন পবিত্র কোরআনে এসেছে-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

অর্থঃ - হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নয় বরং তিনি আল্লাহরই রসূল ও সর্বশেষ নবী...। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষনবী হওয়ার উপর সকল সাহাবা এবং পূর্ববর্তী সকল আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। তাই এরূপ একটি স্পষ্ট ও ইসলামের অন্যতম আক্বীদাকে অস্বীকার করার কারণে কাদিয়ানীদেরকে দ্বীনের অন্যান্য হুকুম আহকাম, যথা নামায, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করার পরও কাফির বলা হয়।

কাফিরকে অবশ্যই কাফির বলা যাবে যদি স্পষ্ট কুফরি প্রমাণিত হয়। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা কাফিরুনে আল্লাহ প্রিয়নবীকে সম্বোধন করে বলেন

الْكَافِرُونَ (হে হাবীব! আপনি বলুন হে কাফিরগণ!) এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, কাফিরকে অবশ্যই কাফির বলতে হবে। আর প্রকৃত ঈমানদারকে অবশ্য কাফির বলকে হবে। আর প্রকৃত ঈমানদারকে অবশ্য মুমিন বা ঈমানদার বলে সম্বোধন করতে হবে। এটাই কোরআন-সুন্নাহর ফায়সালা। [শরহে আক্বাইদে নাসাফী, নিবরাস, খিয়ালী ও শরহে মাওয়াক্বিফ ইত্যাদি দেখুন]

প্রশ্নঃ হাদীস শরীফে হারাম খাদ্য খাওয়া ও হারাম ব্যবসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল- কোন কোন ঔষধে হারাম সামগ্রী মিশ্রিত থাকে। এখন কি ওই ঔষধ খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে? আর যারা ঔষধের ব্যবসা করে তারা কি ঔষধের ব্যবসা বন্ধ করে দিবে?

উত্তরঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- **ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم** - অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা হারাম বস্তুর মধ্যে আমরা উম্মতের জন্য শিফা রাখেননি। অতএব যে ঔষধ সামগ্রীতে নিশ্চিতভাবে হারামবস্তু মিশ্রিত আছে, তা জেনেগুনে খাওয়া এবং এসব ঔষধের ব্যবসা করা অবৈধ ও গুনাহ। আমাদের জানা মতে সচরাচর সকল ঔষধের মধ্যে হারাম বস্তু মিশ্রিত করা হয়না। তাই মুসলমানদের আরোগ্য লাভের জন্য সেসব ঔষধ ব্যবহার করা ও ব্যবসা করা অসুবিধা নাই। তবে কোন কোন ফক্বীহ বর্ণনা করেছেন, যদি কোন মুসলিম পারদর্শী অভিজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, এই রুগীর জন্য এ হারাম বস্তুই ঔষধ ও শেফা। তখন প্রাণ রক্ষার্থে উক্ত মুসলিম পারদর্শী ডাক্তারের নিশ্চিত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে উক্ত হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে শেফার জন্য ব্যবহার করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে অসুবিধা নাই। তবে অধিকাংশ ফক্বীহ ও ইমামগণ এ জাতীয় হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে পান ও ব্যবহার করাকে নিষেধ করেছেন। যেহেতু উক্ত হারাম বস্তুতে শেফা বা আরোগ্য হবে তার নিশ্চিত নাই। [দুররুল মুখতার ও রদুল মুহতার ইত্যাদি]

সূফী মুহাম্মদ মুরশেদ আহমদ খন্দকার, ইরওয়ান, আউপাড়া, লাকসাম, কুমিল্লা

প্রশ্নঃ ওজু করার সময় প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করতে হয় ভুলক্রমে একটি হাত দু’বার ধৌত করলে

ওজুর শেষ পর্যায়ে খেয়াল হলে পুনরায় শুধুমাত্র ওই হাতটা আরেকবার ধৌত করলে চলবে, না আবার সম্পূর্ণ ওজু করতে হবে? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তরঃ ওজুতে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা সুন্নাত। সুতরাং কেউ ভুলক্রমে যদি কোন অঙ্গ দু'বার ধৌত করে তবে তার ওজু পূর্ণ হয়ে যাবে। তাকে পুনরায় ওজু করতে হবে না।

প্রশ্নঃ মানুষ সাধারণত দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে ঘুমায়। তবে উত্তর দিকে পা দিয়ে ঘুমানো কোন শরীয়তে গুনাহ বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শানে বেআদবীর শামিল কিনা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তরঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বলেছেন, তোমরা পবিত্র কাবাকে সামনে ও পেছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করো না। তাছাড়া মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন “যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করল, নিশ্চয় তা অন্তরের তাকুওয়া-খোদাভীতির দলিল।” যেহেতু কাবা শরীফ আল্লাহর নিদর্শন ও সম্মানিত এবং এটি আমাদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তাই আমরা এ সম্মানার্থে পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ঘুমায়, পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমায় না। আর পবিত্র রওজায়ে রসূল যেহেতু মক্কা শরীফের উত্তর দিকে অবস্থিত। সুতরাং মক্কাবাসীরা উত্তর দিকে মাথা দিয়ে ঘুমায় রওজায়ে পাকের সম্মানার্থে। তবে আমাদের দেশে আমরা প্রায় উত্তর দিকে মাথা দিয়ে ঘুমায়। যেহেতু উত্তর দিকে মাথা দিয়ে ডান কাত হলে ঘুমোলে চেহারা কেবলা মুখি হয়। সুতরাং এ নিয়মে ঘুমানো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতম অভ্যাস ও উত্তম তরিকা। আমাদের দেশে একই উদ্দেশ্যে এ নিয়মে দাফন করা হয়। তার বিপরীতে কেউ যদি উত্তর দিকে পা দিয়ে ঘুমায় তাতে অসুবিধা বা গুনাহের কোন কারণ নেই। উল্লেখ্য যে, কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহ-রসূলকে স্মরণ করতে দু'আ-দুরূদ পড়ে ঘুমানো মুস্তাহাব ও অতীব কল্যাণকর।

মুহাম্মদ মকবুল হুসাইন, রেলওয়ে কর্মকর্তা, কচুয়া, চাঁদপুর।

প্রশ্নঃ মসজিদে ফরজ নামাযের জামা'আত শুরু হওয়ার আগে লাল বাতি জ্বালানো কতটুকু শরীয়তসম্মত তা না জ্বালালে কি গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে? জানানোর

অনুরোধ রইল।

উত্তরঃ মসজিদে লালবাদি জ্বালানো একটি 'উত্তম বিদ'আত'। যা ফরজ নামায শুরু হওয়ার পূর্বে জ্বালানোর উদ্দেশ্য হল, সকল মুসল্লী যাতে এক সাথে তাকবীরে উলাসহ জামা'আতে শরীক হতে পারে সে জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সঙ্কেত দেওয়া হয়। তবে লাল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা না করলেও কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ আল্লাহ এক, রসূল এক, কোরআনুল করীম এক, হাদীস পাক এক তবে মুসলমানের ভিতর এত দল-উপদল কেন?

উত্তরঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সকলেই জাহান্নামী। সাহাবা-ই কেরাম আরজ করলেন- হে আল্লাহর রসূল! সে দল কোনটি? আর তাঁদের নিদর্শন কি? উত্তরে প্রিয় রসূল এরশাদ করলেন, যে দলে আমি ও আমার সাহাবা-ই কেরাম রয়েছেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, প্রিয় রসূলে উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সকলের আল্লাহ এক, রসূল এক, কোরআন এক এবং হাদীসও এক। তথাপিও ৭২ দলের অনুসারী সকলেই জাহান্নামী। আর জান্নাতী দলের অনুসারী তাঁরাই, যারা আল্লাহর রসূল ও তাঁর সাহাবা-ই কেরামকে সর্বোচ্চ সম্মান ও অনুসরণ করে। আর সে দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা সুন্নী মুসলমান। তারা নবীর শানে কোন প্রকার কটুক্তি করনো, কোন সাহাব-ই কেরামকে গালমন্দ করেনো এবং আউলিয়া-ই কেরামের শানে বদআক্বীদা পোষণ করেনো যেমনটি করে থাকে ওহাবী-দেওবন্দী, তাবলীগি, শিয়া-রাফেযী-খারেজী ও মওদুদীপন্থী তথা জামা'আতে ইসলামী ইত্যাদি ভ্রষ্টদলপন্থীরা। সুতরাং প্রমাণিত যে, সুন্নী মুসলমানরাই হক্ক আর বাকী সব দলই ভ্রষ্ট।

এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন- হযরত পীরানেশীর দস্তগীর গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক রচিত 'গুনিয়াতুত তালিবীন', হযরত মোল্লা ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত' ও হযরত মোল্লা আহমদ জীউন রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রচিত 'তাকসীরাতে আহমদিয়া ইত্যাদি।

মুহাম্মদ সাজেদুল হক, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সন্তুষ্টির উদ্দেশে আল্লাহর নামে যবেহকৃত পশুর মাংস খাওয়া কি জায়েয? আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নতকৃত খাদ্যবস্তুর হুকুম কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তরঃ মাতাপিতা, পীর-বুয়ুর্গের ঈসালে সাওয়াব ও ওরস উপলক্ষে আউলিয়া-ই কেরামের মাযার শরীফে মান্নতকৃত পশু আল্লাহর নামে যবেহ করে গরীব-মিসকীনসহ সাধারণ মানুষকে খাওয়ানো একটি উত্তম ও সাওয়াবের কাজ। আল্লামা মোল্লা আহমদ জীউন রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিখ্যাত তাফসীরের কিতাব ‘আত্ তাফসীরাতিল আহমদিয়া’তে বর্ণনা করেছেন-

ومن ههنا علم البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله هليها وقت الذبح وان كانوا يندرونها له
অর্থাৎ - এখান থেকে জানা গেল, যে সমস্ত গরু/হালাল জন্তু আউলিয়া-ই কেরামের দরবারের জন্য নযর বা মান্নত করা হয়েছে যা আমাদের সময়ে প্রথা চালু আছে তা আহার করা হালাল ও তৈয়্যব (পবিত্র)। কেননা, এগুলো যবেহের সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়না। বরং আল্লাহর নামেই যবেহ করা হয়। যদিও তা তাদের দরবারের জন্য মান্নত করা হয়েছে। বুঝা গেল এ ধরনের মান্নত শরঈ নয় বরং উরফী বা লুগাবী। এতে কোন প্রকারের অসুবিধা নেই। [তাফসীরাতে আহমদিয়া: সূরা বাক্বারা: পৃষ্ঠা ৪৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য জা-আল হক কিতাবটি দেখুন।

মুহাম্মদ নূরুল হক, সিলেট

প্রশ্নঃ হুজুর আমাদের দেশে অনেক ইঙ্গুরেল আছে। এতে লোকেরা বিভিন্ন মেয়াদে বীমা করছে। মেয়াদ শেষে পরিশোধিত অংশের চেয়ে লভ্যাংশ অনেকাংশ বেশি হয়, এ লভ্যাংশ কি সুদ হবে? সুদ হয়ে থাকলে অনেক ইমাম ও মুয়াজ্জিনও এ সুদের ব্যবসায় নিয়োজিত এদের পেছনে নামায শুদ্ধ হবে কিনা জানালে উপকৃত হব।

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত টাকার উদ্ভৃতাংশ সুদ হওয়ার অবকাশ রয়েছে। বিধায়

বীমা করণ থেকে বিরত থাকবে। আর যে সমস্ত মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, হাফেয এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছেন, তাদের প্রথমে এ ব্যাপারে অবহিত করা হবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে তাহলে তাদের পিছনে নামায পড়া যাবে। আর যদি তারা এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও বীমায় লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের পিছনে ইক্বতিদা করা থেকে বিরত থাকা শ্রেয় ও নিরাপদ। হযরত মুফতী ওকারুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অনেক প্রখ্যাত ওলামা-ই আহলে সুন্নাত ও এ জাতীয় প্রথা থেকে দূরে থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। দেখুন ফিক্বহশাফের কিতাবসমূহ।

প্রশ্নঃ বিয়ে করা সুন্নত তেমনি আকীকা করাও। প্রশ্ন হল, আকীকার গোশত দিয়ে বিয়ের মধ্যে লোকদের খাওয়ালে আকীকা শুদ্ধ হবে কিনা? উত্তর পেলে খুশী হব।

উত্তরঃ আকীকার গোশত বিয়েসহ সকলে খেতে পারবে। এতে কোন নিষেধ নাই; আকীকা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ আহমেদ রেজা, শাহজাহানপুর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ কোরবানীর পশু যবেহ করার সময় কোরবানীদাতার যে নাম দেওয়া হয়, তার নিয়ম কিরূপ? যদি কোরবানীদাতার নাম দেওয়া না হয় তাহলে ক্ষতি হবে কি? বিস্তারিত প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তরঃ কোরবানীর পশু আল্লাহর নামে যবেহ করার পর যাদের নামে কোরবানী দেওয়া হবে তাদের নাম উচ্চারণ করবে। যদি কেউ ভুলবশত উচ্চারণ নাও করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। মনে মনে নিয়্যত করলেও তাদের পক্ষ থেকে কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ সবারই অন্তরের খবর রাখেন।

প্রশ্নঃ শিশু জন্মগ্রহণ করলে যে আযান দেওয়া হয়, তার প্রচলন কখন থেকে শুরু? যদি আযান দেওয়া না হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তরঃ শিশু জন্মগ্রহণ করার পর আযান দেওয়া প্রাকইসলামী যুগ থেকেই প্রচলিত বরকতপূর্ণ একটি আমল। শয়তানের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুর জন্মের পর আযান দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্ববহ। যাতে শুভজন্মের সাথে সাথে প্রথমে কানে আল্লাহ-রসুলের পবিত্র নাম শুনে এবং শয়তানের

কুপ্রভাব থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়। উল্লেখ্য যে, নবজাত শিশু ও বেহুঁশ ব্যক্তির কানে আযান দেওয়া মুস্তাহাব।

আলহাজ্ব গোলাম সরওয়ার, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর

প্রশ্নঃ পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে নতুন মসজিদ করার সময় কোন ভাবে নামাযের স্থানকে মার্কেট করা যায় কিনা? এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য ফিক্বহর কিতাবের সূত্র ও পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করে ফতোয়াদান করে স্থানীয় সুন্নী মুসলমানদের প্রাণের দাবী মেটাতে আপনার মর্জি হয়।

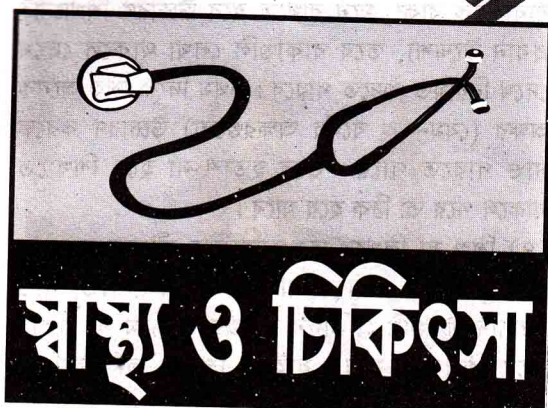
উত্তরঃ পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে নতুন মসজিদ তৈরি করলে পুরাতন মসজিদের স্থানে কোনরূপ মার্কেট ইত্যাদি তৈরি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যেহেতু উক্ত পুরাতন মসজিদে নামায-কালেমা ও জুমা-জামাত ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসার কারণে তা মাটি হতে আসমান পর্যন্ত মসজিদ শর'ঈ হিসেবে সাব্যস্ত ও নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজনে তা ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণ করা হলে প্রথম তলায় বা দ্বিতীয় তলায় কোথাও মার্কেট দোকান পাঠ ইত্যাদি করা যাবে না। তবে একটি খালি স্থানে সবে মাত্র নতুনভাবে মসজিদ তৈরি করার সময় মসজিদের স্বার্থে মসজিদের ব্যয়ভার পরিচালনার জন্য নিচ তলায় বা উপরে দোকান পাঠ করা যাবে।

মূল মসজিদ ওই ভূখন্ডকে বলে যা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকুফ করা হয়েছে। সুতরাং ওয়াকুফকারী মসজিদের জন্য যে চতুর্সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছে ওই ভূমিই মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। এ ছাড়া মসজিদের আশপাশের জায়গা মসজিদের হুকমে পড়বে না। অতএব, মসজিদের চার দেয়ালের বাইরে বর্ধিতাংশ মসজিদের জন্য নির্ধারণ করে না থাকলে তাতে বসবাসের ঘর নির্মাণ করা যাবে। তবে পায়খানা-প্রস্রাবখানার গন্ধ মসজিদের মধ্যে আসলে মসজিদের আশে-পাশের বাথরুম-টয়লেট নির্মাণ করবেনা, যাতে মুসল্লীদের কষ্টের কারণ না হয়। মসজিদ নির্মাণ করার পূর্বেই যদি মসজিদের ছাদের উপর ইমাম বা মুয়াজ্জিনের জন্য ঘর তৈরি করার নিয়ত করা হয়, তবে তা জায়েয। ওই ঘরে ইমাম বা মুয়াজ্জিন বসবাস করতে পারবে। যেহেতু নীচে মসজিদ বিধায় ইমাম-মুয়াজ্জিনকে বসবাস করার সময় অতীব সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে,

সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। উল্লেখ্য সর্বাবস্থায় মসজিদের উপরে স্ত্রী সহবাস, পায়খানা-প্রস্রাব করা মাকরুহে তাহরীমাহ ও অবশ্যই গুনাহ। কিন্তু মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের ছাদের উপর ইমাম মুয়াজ্জিন থাকার জন্য ঘর নির্মাণও করা যাবে না। যদি নির্মাণ করা হয় তবে ওই ঘর ভেঙ্গে দেওয়া ওয়াজিব যেহেতু তখন জমি থেকে আসমান পর্যন্ত ওই নির্ধারিত স্থানে মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে। [সূত্র: দূররে মুখতার: ১ম খন্ড: ৬৫৬ পৃষ্ঠা ও বাহারে শরীয়ত]

দূররে মুখতার, হেদায়া, তাবয়িন ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি শরীয়তের নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির আলোকে স্পষ্ট হয়ে যায়, কোন নির্ধারিত স্থানে মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের উপরে বা নিচে ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য থাকার ঘর এবং মসজিদের উপকারার্থে দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করা যাবে না। তবে মসজিদ হওয়ার পূর্বে শুধু মসজিদেরই স্বার্থে মসজিদের নিচে উপরে ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য ঘর বা দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করা জায়েয। তবে উক্ত ঘর বা দোকান মসজিদের সীমানার বাইরে না হলে, (মসজিদের সীমানায় হলে) ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য নির্মিত ঘরে স্ত্রী সহবাস ও পায়খানা-প্রস্রাব করা যাবে না। এটাই শরীয়তের ফায়সালা।

প্রশ্নঃ নতুন মসজিদ বানানোর ক্ষেত্রে পুরাতন স্থানে নামায জারি রাখা প্রয়োজন কিনা? না অন্যত্র সাময়িক মসজিদ তৈরি করে সেখানে পাঞ্জগানা ও জুমা কায়েম করা প্রয়োজন। যদি দ্বিতীয় নিয়মে কেউ ঐ মসজিদের নামে সাময়িক মসজিদ তৈরি করে তবে সেটির পরিত্যক্ত অবস্থার বিষয়ে শরীয়তের ফায়সালা কী হবে? **উত্তরঃ** নতুন মসজিদ তৈরি করার সময় পুরাতন স্থানে নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকলে সেখানে পড়বে। আর যদি অন্যত্র সাময়িকভাবে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেখানে জামাত ও জুমা আদায় করা যাবে। তবে পরবর্তীতে মসজিদ নির্মিত হয়ে গেলে সেখানে নামায না পড়ে অন্যান্য কাজও করা যাবে। এতে কোন বাধা নেই। -[রদুল মুহতার ইত্যাদি]



স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা



বোবা হবার কারণ ও প্রতিকার

মঈনুল ইসলাম (হাসিব)

বাংলাদেশে মুখ-বধিরে সংখ্যা আনুমানিক দশ লক্ষ তবে এ সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিপুল সংখ্যক শিশু এদেশে বধির হয়ে যাচ্ছে, মাতৃ জঠরে অবস্থানকালে অনেক শিশু বিভিন্ন কারণে জন্মের পূর্বেই বধির হতে পারে। আবার জন্মের পর বিশেষ কিছু কারণে অনেক শিশু শ্রবণ শক্তি হারায়। এসব শিশু স্ট হিয়ারিং এর জন্য শব্দ, কথাবার্তা শোনা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা কথা শিখতেও পারে না এবং বলতেও পারে না। অনেকেই তাদেরকে বোবা বলে থাকেন। এ ছাড়াও ভোকাল ও কর্ডের জন্মগত ত্রুটির কারনেও কিছু বাচ্চা বোবা হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ত্রুটি খুব কম বাচ্চাদেরই হয়ে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে, বধিরতাই বোবা হবার প্রধান কারণ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যেসব শিশু কথা বলতে পারেনা (কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ করতে পারে) তাদের প্রায় সবাই কানে কম শোনে বা মোটেই শোনে না। আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কারমূলক ধারণা বিদ্যমান থাকায় এবং এ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত কোন প্রচারনা না থাকায় বোবা শিশুদের অভিভাবকগণ বোবা হবার মূল কারণ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। তারা এটাকে ভাগ্যের পরিহাস ধরে নিয়ে হা-হুতাশ করতে থাকেন। ফলে আজীবন বোবা সদস্যই থেকে

যায়। এসব শিশুদের লেখাপড়াতো হয়-ই না স্বাভাবিক জীবন-যাপনও ব্যাহত হয়। তাদেরকে আজীবন মুখরিত পৃথিবী থেকে দূরে ভাষাহীন এক বন্ধ খাচায় জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু বধিরদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কথা বলানো সম্ভব।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মোতাবেক বধিরদের কানে 'হিয়ারিং এইড' লাগিয়ে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে কথা বলানো যাচ্ছে। যারা কানে মোটেও শোনেনা তাদেরকেও 'লিপ রিডিং-এর মাধ্যমে কথা শিখানো যায়। বধিরাও স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলতেও জীবন-যাপন করতে পারে। তারাও তাদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারে।

মুখ-বধির শিশুদেরকে বোবা মনে না করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আপনাকে প্রথমেই জানতে হবে, বধির শিশুকে চেনার উপায় কি? আপনি লক্ষ্য করুন:

- * বধির শিশুদের পিছন থেকে কোন শব্দ করলে তাকায় কি না?
- * কারো কথাবার্তার প্রতি তাদের কোন আগ্রহ আছে কি না?
- * একা একা চুপচাপ খেলতে পছন্দ করে কি না?
- * 'শব্দ করে' এমন কোন খেলনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে কি নেই?
- * বয়স হওয়া সত্ত্বেও শিশু কথা বলছে না। কিন্তু নানা প্রকার শব্দ করতে পারছে এমন কি না?
- * শিশু সবকিছু ইশারায় বুঝাতে চেষ্টা করেছে কি না?
- * অনেক ক্ষেত্রে শিশু জেদী হয়ে থাকে, তারা অল্পতে কান্নাকাটি করে।
- * কোন স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর ক্ষেত্রে এসব লক্ষণ দেখা গেলে প্রথমেই তার কানের প্রতি নজর দেয়া অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে নাক, কান, গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিশুর কান পরীক্ষা করে 'হিয়ারিং এইড' লাগানোর পরামর্শ দেবেন। শিশুকে এটির প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। তার কানে এটি লাগিয়ে সুন্দর মিউজিক শোনানো যেতে পারে। এছাড়া টিভিতে ছোটদের অনুষ্ঠান, কার্টুন ছবি ইত্যাদি শোনার প্রতি উৎসাহ দিতে হবে। এভাবে যত বেশীক্ষণ কানে যন্ত্রটি রাখা যাবে ততই শিশু শব্দময়, কথার জগতের

সাথে পরিচিত হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন হিয়ারিং এইড চিকিৎসকের পরামর্শমত নির্দিষ্ট পাওয়ারে ব্যবহার করা হয়।

এরপর আসা যাক কিভাবে শিশুকে শিখাতে হবে সে প্রসংগে। কথা শিখাতে হলে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শিশুর সাথে সব ধরনের ইশারায় কথাবার্তা বন্ধ করতে হবে। তাঁকে দেখতে হবে সে কথার মাধ্যমেই একমাত্র ভাব প্রকাশ করতে হয়। এ ব্যাপারে বাসার সবার প্রয়োজন বধির বাচ্চাকে কথা শিখানোর জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সে মনে করে অন্যান্যদের মত এভাবে সেও লেখাপড়া করছে।

(১) প্রথম এমন কিছু শব্দ বাছাই করতে হবে যা সহজে উচ্চারণ করা যায়, যথা- আব্বা, আম্মা, ভাইয়া, আপু, পাতা, ফুল, আম, আপেল, আতা, মাছ, ভাত, পানি, বই, বাসা, বল, পুতুল, বাবু ইত্যাদি।

(২) এসব জিনিষ সামনে এনে বা ছোটদের বই থেকে ছবি বের করে দেখাতে হবে। সবচে ভাল হয় কাগজের কার্ড তৈরী করে তাতে জিনিষটির সুন্দর ছবি এঁকে এবং তার নীচে নাম লিখে শিখানো।

(৩) মনে করুন, পাতা শব্দটি আপনি শিখাতে চান। প্রথমে শিশুটির কানে হিয়ারিং এইড লাগিয়ে একটি পাতা এনে এবং পাতার কার্ডটি দেখিয়ে শিশুর সামনে বলতে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে, যে শিশু আপনার ঠোঁট ও জিহবার নাড়াচাড়া ধেকে করায়ও করায়ও করতে পারে, যাকে বলা হয় “লিপ রিডিং”। ‘পাতা’ শব্দটি উচ্চঃস্বরে এবং ধীর গতিতে বলতে হবে এবং সাথে সাথে শিশুকে বলতে চেষ্টা করতে হবে।

(৪) একটি শব্দ যতদিন না শিখবে ততদিন ধৈর্য সহকারে শিখাতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাবা-মা অথবা যার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে তাকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৫) এভাবে যতগুলো শব্দ সম্ভব শিখানো যেতে পারে। এক সময় দেখা যাবে, বাচ্চাটি কার্ডের ছবির সাথে লেখাটিও চিনে ফেলেছে। তখন তাকে শব্দগুলি দেখে লেখার অভ্যাসও করানো যেতে পারে। এতে সে লেখার ভূবনের সাথেও পরিচিত হবে।

(৬) শিশু যখন উচ্চারণে ও লিখায় অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তখন খাতায় ছোট ছোট বাক্য লিখে তার উচ্চারণ শিখাতে হবে। যেমন আমার নাম আদিবা,

আমার বই আছে, আমি বাসায় যাব, আমার জামা লাল, আমি ভাত খাব, পানি দাও ইত্যাদি সহজ বোধ্য ব্যবহারিক বাক্য, মনে রাখতে হবে উচ্চারণ শিখানোই প্রধান উদ্দেশ্য, তবে বাক্যগুলি লেখা থাকলে দেখে দেখে নিয়মিত পড়তে পারবে। প্রথম দিকে শিশু অনেক অক্ষর (যেমন ক বর্ণের অক্ষরগুলো) উচ্চারণ করতে নাও পারতে পারে। তবে হতাশ না হয়ে শিখাতে থাকলে পরে তা ঠিক হয়ে যাবে।

(৭) শিশু যা লিখবে তা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করাতে হবে। এছাড়া আস, যাও, বস, লও, নাও ইত্যাদি শব্দগুলি প্রতিদিন কাজের মাধ্যমে দু’ একটি করে শিখানো যায়। যাই-ই শিশুক তা নিয়মিত প্র্যাকটিস করলেই শুধু উপকার পাওয়া যাবে।

এভাবে ধর্য ও আত্ম বিশ্বাসের সাথে চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ আপনার বধির শিশু অবশ্যই কথা বলবে। বাংলাদেশে বধিরদের কথা শিখানোর প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে তারা সাধারণ মানুষের মত কথা বলতে এবং সাধারণ স্কুলে পড়তে পারছে। আমাদের দেশে যে দু’এটি প্রতিষ্ঠান আছে তা বিভিন্ন কারনে সবার নাগালের মধ্যে নয়। তাই এদেশে কথা শিখানোর পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, যা সর্বস্তরের মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে। আশা করি এ ব্যাপারে সরকার এগিয়ে আসবেন। এ ছাড়াও দানশীল ও শিক্ষানুরাগী মহানুভব ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

লেখার আহবান

কানযুল ইমান এর জন্য প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, ফিচার, কবিতা সংগঠন সংবাদসহ যে কোন সুন্দরী মতাদর্শ ভিত্তিক তত্ত্বপূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ লেখা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

☆ সাদা কাগজের পূর্ণ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখকের নাম ঠিকানা উল্লেখ পূর্বক লিখতে হবে।

☆ ফটোটাইপটি কপি গ্রহণযোগ্য নয়; মূল কপি পাঠাতে হবে।

☆ কোন লেখা গ্রহণ করা কিংবা বাদ দেয়া সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

☆ অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা প্রেরণের ঠিকানা

কানযুল ইমান ২০৫/৫, আল-বশির প্রাজা, (২য় তলা)

ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ফোন : ৯৩৪০৮০০০

ই-মেইল: kanjuliman@yahoo.com